যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের জীবনপঞ্জিকায় তাঁর চন্দননগরে আগমন, স্থিতি, আবার পণ্ডিচারীতে মহাপ্রস্থান—একটী ঘটনা, কিন্তু বাংলার বিপ্লবযুগের উহা এক গূঢ় রহস্যগর্ভ প্রধান ঘটনা। উহা দৈব ঘটনাও বলা যাইতে পারে। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই এই দৈব ঘটনার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়—ইহা এখন ঐতিহাসিকের সম্পত্তি :—

"Here are the facts of that departure. I was in the Karmayogin office when I received the word on information given by a high-placed police official, that the office would be searched the next day and myself arrested. While I was listening to animated comments from those around on the approaching event, I suddenly received a command from above, in a Voice well-known to me in three words : "Go to Chandernagore."

In ten minutes or so I was in the boat for Chandernagore. Ramchandra Majumdar guided me to the Ghat and hailed a boat and I entered it at once along with my relative Biren Ghose and Moni (Suresh Chandra Chakravarty), who accompanied me to Chandernagore. We reached our destination while it was still dark; they returned in the morning to Calcutta.

There was no arrangement for my staying in Chandernagore. I went without previous notice to

anybody and was received by Motilal Roy who made secret arrangements for my stay ; no-body except himself and a few friends knew where I was. The warrant of arrest was suspended." *

তিনি আরও এইটুকু লিখিয়াছেন :

"I remained in secret entirely engaged in sadhana. Afterwards, under the same "sailing orders" I left Chandernagore and reached Pondicherry on April 4, 1910."*

শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি বা লিপি—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের। ইহারও প্রায় ২৬ বৎসর পূর্ব্বে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমি যখন পণ্ডিচারী যাই, তখন আমার এই আদেশ-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরেই তিনি নিজ মুখেই আমায় বলিয়াছিলেন :

"তোমরা আদেশ বল কাকে? তা' কি রকমে হয়? তখন 'কর্ম্মযোগিন্' মামলা—প্রশ্ন উঠেছিল—পূর্ব্ববৎ রাজনীতিক জীবন, না ভারতের সাধনসিদ্ধ জীবন? কোনও বুদ্ধিবিবেচনা করলুম না—আদেশ পেয়েছিলুম—'Go to Chandernagore.' কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই বুঝি-নি! তৎক্ষণাৎ শুনেছিলুম।

"The same thing with Pondicherry coming. এরূপ আকাশ-বাণী খুব rare জিনিষ। কিন্তু আদেশ miracle নয়।" †

দেবাদিষ্ট পুরুষের জীবনের প্রতি ঘটনা দেবতার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের আগমন-সংবাদ ও

---

* "Sri Aurobindo on Himself"—৯৫ ও ১১৯ পৃষ্ঠা। Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.

‡ "অরবিন্দ মন্দিরে"—৫৫ পৃষ্ঠা। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স।

তাঁর গোপন আশ্রয়ের স্থান মিলে নাই, ইহা শুনিয়া শ্রীমতিলাল স্বতঃ-সিদ্ধ অন্তর-প্রেরণায় গঙ্গার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হন ও ক্ষণিক পরিচয়েই একেবারে অকুণ্ঠ দরদে ও নির্ভয় উল্লাসে সেই শাসন-ত্রাসিত দুর্দ্দিনে সেই বিপ্লবগুরু যুগনায়ককে নিজ গৃহে বরণ করিয়া লন ও তাঁর অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করেন। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ ১৯১০ এই মাত্র ৪০ দিন কাল অন্তরসাধনায় পূর্ণ নিমগ্ন থাকেন, এই কথাই তাঁর উপরোক্ত লেখাটুকুতে জানা যায়। এ সাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম ও অনুভব তিনি বাহিরে আর কোথাও বিশেষভাবে বোধ হয় ব্যক্ত বা প্রকাশ করেন নাই।

বরোদায় শ্রীমৎ বিষ্ণু ভাস্কর লেলেজীর সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্ম-সংযোগের কথাও তিনি নিজে উল্লেখ করিয়াছেন—ইঁহার নির্দ্দেশিত যোগপথ গ্রহণ করিয়া তিন দিনে অদ্বৈত ব্রহ্ম-সমাধিলাভের কথাও তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীলেলেরই অন্তর-বাণীর আদেশ পাইয়া তিনি অন্তর্য্যামী গুরুর কাছে অতঃপর সর্ব্বতোভাবে আপনাকে নিবেদন করিয়া দেন। ইহাতেই তাঁর পূর্ব্বচেতনার এক আমূল অন্তর্পবিবর্ত্তন ঘটে। তদবধি সেই অন্তর্য্যামী গুরুর নির্দ্দেশেই চলিয়া তিনি তাঁর যোগজীবনে ও কর্ম্মজীবনে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁর বরোদা থেকে কলিকাতায় আসা—জাতীয় মহাবিদ্যালয় ও বন্দোমাতরম্ পত্রিকা-পরিচালনা, প্রকাশ্য রাজনৈতিক ও গুপ্ত বিপ্লবান্দোলনে নেতৃত্ব, বৃটিশরাজের বন্দিশালায় বন্দী হওয়া ও মুক্তিলাভ—তাঁর বাণী, কথা, লেখা, চলা-ফেরা পর্য্যন্ত—সবই পূর্ণনির্ভরশীল শুদ্ধ-সিদ্ধ যন্ত্রের ন্যায় অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানেরই আদেশে বা প্রেরণায় সংঘটিত। কারাগারে তাঁর কৃষ্ণ বা বাসুদেবদর্শন এই অধ্যাত্মানুভূতিরই আর এক সুমহতী

পরমপরিণতি। গীতার 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ'—এই মহাবাণীরই এ যুগের ইহা এক সুমঙ্গল, সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই পরমানুভবের কথাও তিনি বাসুদেবেরই প্রেরণায় উত্তরপাড়ার ধর্ম্মসভায় আবিষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্ম-যোগিন্" পত্রিকায় তাঁর সিদ্ধ লেখনীমুখেও এই অনুভবালোকিত বাণী, ব্যাখ্যা, চিন্তা, কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষার মর্ম্ম-নির্দ্দেশ ও প্রেরণা মুক্ত ধারায় প্রচারিত হইয়াছিল।

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের শুভাগমন—এমনই পরম আত্মসমর্পণ-যোগসিদ্ধ মহাযোগিরূপে—দেবাদেশ অধ্যাত্মশ্রুতিযোগে শুনিয়া তাঁর আগমন, আবার দেবাদেশ তেমনিভাবে পাইয়াই তাঁর পণ্ডিচারীতে প্রস্থান—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা; আবার যুগপৎ ইহা আধ্যাত্মিক ঘটনাও—আমায় বলিতেই হইবে। এমন ঘটনার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যের সম্যক্ পর্য্যালোচনা ও রহস্যোদ্ঘাটনের প্রয়োজন আছে বৈ কি! শুধু শ্রীঅরবিন্দের মহাজীবনেব দিক্ দিয়াই এ-প্রয়োজন নহে, শ্রীঅরবিন্দকে যুগপুরুষ ও জাতিপুরুষ-রূপে কেন্দ্র করিয়া যে যুগ ও জাতির বিবর্ত্তন, তাহারও প্রকৃষ্ট দিগ্দর্শনের জন্যও ইহার আরও বিশেষ, বিশদ ও গুরুতর প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমি মনে করি।

এই প্রয়োজন একদিক্ দিয়া একমাত্র যিনি করিতে পারেন, তিনিই কিছুটা করিয়াছেন। তিনি আর কেহ নন, এই গ্রন্থেরই সুলেখক-রচয়িতা—প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্ঘগুরু স্বয়ম্।

যুগের দুই চিহ্নিত পুরুষ দুই দিগন্তে—এক দিগন্তে মহাগুরুরূপে ও অন্য দিগন্তে সিদ্ধ শিষ্যরূপে—তাঁহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী যোগ-বিয়োগ বা মিলন-বিচ্ছেদের যাবতীয় অন্তরঙ্গ ঘটনা—সে শুধু তাঁহারাই

বুঝিতে পারেন, বলিতে পারেন, ঠিক-ঠিক তার মর্ম্মব্যাখ্যা করিতে পারেন, অন্য কাহারও পক্ষে তাহার সম্ভব নহে, করিলে তাহা অনুমান বা কল্পিত কল্পনাই হইবে—সে অনধিকার-চর্চ্চা আমি করিব না। এরূপ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের কথাই স্পষ্ট, যথার্থ ও খুবই ইঙ্গিত-পূর্ণ : "It would be only myself who would speak of things in my past giving them their true force and significance.

Neither you nor any one else knows any thing at all of my life; it has not been on the surface for men to see."

শ্রীঅরবিন্দের দিক্ দিয়া এই প্রসঙ্গে এইখানেই আমায় ক্ষান্ত হইতে হইবে। আর সঙ্ঘগুরুর দিক্ দিয়া তাঁর মর্ম্মকথা তিনি মর্ম্ম ছানিয়াই তাঁর "জীবনসঙ্গিনী" মহাগ্রন্থে সবিস্তার লিখিয়া গিয়াছেন। "প্রবাসী"-সম্পাদক ৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যে নিবন্ধমালা তিনি রচনা করেন ও "প্রবাসী" পত্রিকায় ১৩৫৮ সালে যাহা প্রকাশিত হয়, সেই নিবন্ধসমষ্টিই সঙ্কলন করিয়া পুনঃ প্রকাশ করা হইল এই "যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ" বইখানিতে। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁর গুরুকে যেমনটী দেখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম-প্রকাশ যেরূপ আমরা পাই তাঁর "My Master as I saw him" গ্রন্থে—সঙ্ঘগুরুর লেখা এই গ্রন্থে আমরা তেমনি পাইব যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দকে সঙ্ঘগুরুরই জীবনলব্ধ অনুভবের দর্পণে।

আমি শুধু সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থোক্ত যে কয়টী বিষয়ে কিছু বলা দরকার, তাহাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমার এই আলোচনা শেষ করিব।

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও প্রেরণারই অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ তত্ত্বরূপে সঙ্ঘসৃষ্টির কথাও আসিয়া পড়ে—ইহা এই গ্রন্থেও দেখা যাইবে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সৃষ্টিমূলে—সঙ্ঘগুরুর যোগদীক্ষা ও তাঁর বিজ্ঞানময় সৃষ্টিপ্রতিভা। শ্রীঅরবিন্দই স্বীয় অনবদ্য ভাষায় তাঁকে লিখিয়াছিলেন :

"The Samgha at Chandernagore is a thing that has grown up with my power behind and yours at the centre and it has assumed a body and temperament which is the result of this organisation."

এ সৃষ্টি তাই যৌগিক—ইহা স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ যুগের প্রয়োজনেই আসিয়াছিলেন—জাতির বাণীমূর্ত্তিরূপে তিনি এ জাতিকে নবজন্মেরই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন—তাঁর পুণ্যজন্মদিনে যে উপহার বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছিলেন—খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা—উহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই রাখিয়া গিয়াছেন জাতির সম্মুখে তাঁর আদি-ব্রত—অখণ্ড ভারতের স্থিরলক্ষ্য। ইহা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর আরাধ্যা আলোকময়ী মহাশক্তির ক্ষান্তি নাই, তাঁর অনিরুদ্ধ-তপস্যার বিরাম নাই। তাঁর এই স্থির স্বপ্নলক্ষ্যে অটুট প্রত্যয় ঢালিয়াই জাতিকে চলিতে হইবে।

তাঁরই আরব্ধ বিপ্লবযজ্ঞ হইতে তিনি বিরত করিয়াছিলেন সঙ্ঘগুরুকে—সঙ্ঘগুরুও তাই ভাঙ্গার রাজসপ্রেরণা ধীরে-ধীরে আত্মস্থ করিয়া ও সংগঠনী শুদ্ধপ্রেরণা আশ্রয় করিয়া নবীন সৃষ্টিসাধনা সুরু করিয়াছিলেন—আজ দেশময় বিপ্লবশক্তির বিকৃত-রূপই সর্ব্বত্র প্রকট—এই বিপর্য্যয় দুর করিয়া জাতির হৃদয়ে শুদ্ধা অন্তর্গঠনশক্তি ব্যাপকভাবে উদ্ভূত করিতে হইবে জাতীয়তার সিদ্ধ পুজারীদেরই।

তিনি দেখিয়াছিলেন—অখণ্ড স্বাধীনভারতপ্রতিষ্ঠার পর, তাঁহার কাজ এশিয়ার জনমণ্ডলীর মুক্তি ও পুনরুজ্জীবন এবং সেই নবসংগঠিত এশিয়া করিবে মহাভারতের নেতৃত্বে মানবসভ্যতার পৌরোহিত্য-গ্রহণ।

তারপর সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর বিশ্বমানব-জীবনের বহির্ভূমি-স্বরূপ চাই অভিনব বিশ্বৈক্য-সঙ্ঘ—World-union—যাহার মধ্য দিয়া অধ্যাত্মদীক্ষা লইবে নিখিল মানবজাতি ভারতীয় জগদ্‌গুরুর চরণতলে।

আর সেই নরোত্তম জগদ্‌গুরুই করিবেন প্রকৃতির শেষ লক্ষ্য-পূরণ—মানবাধারে অতিমানবের—অবতরণে ও অধিরোহণে—কল্পসিদ্ধ দিব্যজীবনে মর্ত্ত্যজীবনের আমূল ও পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর।

তাঁর এই পঞ্চলক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সঙ্ঘগুরুর দীক্ষিত সন্তানমণ্ডলী তাঁরই দেওয়া ত্রিমন্ত্র—জ্ঞান, প্রেম, শক্তি—Culture, Commune & Economy'র ত্রিমুখী অনুশীলনে সঙ্ঘকেই আমরা সিদ্ধ করিব সর্ব্বাগ্রে উহারই অমোঘ সাধনযন্ত্র-রূপে।

তাঁর সাবিত্রী শক্তির আমরা আবাহন করিব সতীসাধ্বী ভারতীয় মাতৃমূর্ত্তির আধারে, যোগেশ্বরী গুরুশক্তি-রূপে তাঁহাকেই বরণ করিব।

আর যুগপুরুষই তো স্বয়ং বিপ্লবী দলের লুণ্ঠিত অর্থোপচার প্রত্যাখ্যান করিয়া, সঙ্ঘগুরুর জীবনে সর্ব্বপ্রথম উৎসর্গশুদ্ধ ও সঙ্ঘসিদ্ধ অর্থসৃষ্টির সূচনা করেন, যার পূর্ণতর সংগঠনে ও পরিপূরণে জাতির ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর স্বর্ণসিংহাসন-সুপ্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

পরিশেষে রাষ্ট্রী দেবী দুর্গার মহাপূজারম্ভ হইবে এই পূর্ণযোগশক্তি ও পূর্ণাঙ্গ সঙ্ঘশক্তিরই সম্যক্ উজ্জীবনে ও ব্যাপক রূপায়নে।

এই পঞ্চশক্তির ভারতীয় আরাধনায় যুগ-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই বর্ষিত হইবে।

দেবী সরস্বতীর আরাধনা করিব—ভারতীয় অষ্টাদশ বিদ্যা ও চতুঃষষ্ঠি কলার উদ্বোধনে ও অনুশীলনে। যুগের বিদ্যা ও অবিদ্যার তর্পণ ও সম্পূরণ এই শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনায় সার্থক হইবে।

শ্রীআধার জাগরণ ও প্রকাশ সঙ্ঘাধারে—প্রেমৈক্যসিদ্ধ সঙ্ঘশক্তি-রূপে—তিনিই উদীয়মানা জাতিশক্তিরও হৃদয়-রূপা মহামাতৃকা।

সঙ্ঘগুরু আত্মসমর্পণ-মহাযোগ সিদ্ধ করিয়া, স্বরূপশক্তির অলক্ষ্য নির্দ্দেশেই তাঁর সিদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরিয়াছিলেন, উহা ছিল তাঁর স্বরূপেরই ডাক। ভারত-ভারতীর অমোঘ, অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় আত্মস্বরূপেই তিনি স্থিরাসীন হইয়াছিলেন। মহাগুরু তাঁকে শেষ মুহূর্ত্তেও দিয়াছিলেন বিজ্ঞানময় সত্য ও আলোর আশীর্ব্বাদ—"I wish you descent of Truth and Light"; আর পরে দিব্য মানবতারও অমর আশীর্ব্বাণী—"Be Divine Man".

ভূকম্পের যেমন উৎপত্তিকেন্দ্র (epi-centre) থাকে, যুগশক্তিরও তেমনি থাকে সুনির্দ্দিষ্ট উৎসকেন্দ্র—ভারত-ভারতীর সেই চিহ্নিত উৎসতীর্থ ইতিহাসের মহাকালস্রোতে স্বতঃই আত্মপ্রকাশ ও বিশ্ব-জীবনে আপনাকে সুপ্রকট করিবে। সেই ভবিষ্য জাতীয়াত্মারই [নবারুণদীপ্ত সহস্রদলে সহস্র ধারার অংশমালায় অজস্র বর্ষণ করিতেছেন—অমৃতত্বেরই ঝরণা—বিশ্বযোগের যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই—জাতির আত্মায় ও জাতির কর্ম্মে—

Arun, My blessings on you and your work—
Sri Aurobindo
January 28-1947

Arun, My blessing on you and your work—
Sri Aurobindo, January, 28-1947

"ওঁ নমো ভগবতে শ্রীঅরবিন্দায় নমঃ"

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত
(সভাপতি, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ)

যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

(শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের অজানা অধ্যায়)

যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ

॥ এক ॥

শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে চন্দননগরে আসিয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ্চ তিনি চন্দননগর থেকে আবার রওনা হন এবং ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচারীতে পৌঁছান। জাতীয়তার ঋষি বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিলেও, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারই নির্দ্দেশে বাংলায় বিপ্লব-কর্ম্ম পরিচালিত হইত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তিনি ইংরেজী "আর্য্য" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদক হন সংযুক্তভাবে তিনি স্বয়ং, মঁসিয়ে পল রিশার এবং তদীয় পত্নী মাদাম রিশার। এই আর্য্য-পত্রিকাখানির প্রকাশের পর হইতেই তিনি আমাকে বিপ্লবের পথ হইতে ফিরাইয়া, অধ্যাত্ম-ভিত্তির উপর সংগঠনের পথে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে তিনি আর্য্য-পত্রিকার সম্পাদন-ভারও পরিত্যাগ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই মঁসিয়ে পল রিশার শ্রীঅরবিন্দের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং কিছুদিন তিনি আমার সহিত চন্দননগরে বাস করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের শ্রীঅরবিন্দকে আমি অনুভব করিয়াছি এবং তাঁহার কথা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যাহা সত্য, তাহা পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত না হইলে, শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক সত্য তথ্য অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইবে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন চারি পর্ব্বে বিভক্ত করা যায়। তাঁহার বাল্য-জীবন ও কৈশোর-জীবন, তাঁহার স্বদেশীযুগের নেতৃজীবন, ১৯১০ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার সাধনজীবন ও তৎপরে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহার একান্ত অধ্যাত্মজীবন বা অতিমানস-জীবন। তাঁহার প্রথম তিনটি যুগপর্ব্বের ইতিহাস জানি। ১৯২৬ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের যে জীবন, তাহার প্রকাশকেন্দ্র মীরা দেবী। তিনিই পণ্ডিচারী আশ্রমের মাতৃরূপে শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। এই যুগের কথা আমার পক্ষে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন স্বনাম-প্রসিদ্ধ ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। ইনি আই-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। কোন্নগরে এখনও তাঁহার বাস্তুভিটা বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণধনবাবু সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন, পুত্রগণেরও তদনুযায়ী চরিত্রগঠনের জন্য আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যপক্ষে তাহার বিপরীত সাধনায় শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর দান বাঙালী জাতি কোনদিন বিস্মৃত হইবে না। যখন বাঙালী জাতি পাশ্চাত্ত্য ভাবমদিরায় এক প্রকার উন্মাদ, সেই সন্ধিযুগে সেই প্রচণ্ড বন্যা প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাজনারায়ণ বসুই জাতিকে হিন্দুত্বের অমৃত-রসায়ন পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার সহিত

তাঁহার সম্পর্কের পরিচয় যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই এই কথা স্বীকার করিবেন। রাজনারায়ণ বসুকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ বলিয়াই শুধু গর্ব্ব করি না। সে যুগে হিন্দু জাতীয়তার গৌরব তাঁহারই জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণধনবাবু যেমন একদিকে তাঁহার সন্তানদের পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে গড়িতে চাহিয়াছিলেন, অন্যদিকে রাজনারায়ণ বসু ভারতের জাতীয়তার জনকরূপে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে অসাধারণ প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এইজন্য বাহ্যতঃ অনেক সময়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গভীর প্রভাব দেখিলেও, প্রাচীন ভারতের মর্ম্মপ্রেরণায় তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ হইতে দেখিয়াছি, সে কথা পরে বলিব।

কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রসহ তৃতীয় পুত্র শ্রীঅরবিন্দকেও দার্জ্জিলিঙের কন্‌ভেন্টে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ইংরেজী হাবভাবের সহিত পরিচয় করিয়া তাঁহার সন্তানেরা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য ; কিন্তু মাতামহের রক্তধারার অনুপ্রেরণা শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ক্রমেই লীলায়িত হইয়া উঠিল। রাজনারায়ণ বসুর উদ্দীপনায় যে জাতীয় সভা স্থাপিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য ছিল—"হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতিসাধন করা।" শ্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণধনবাবুর চেষ্টা সত্ত্বেও, পরিপূর্ণরূপে সাহেব হইতে পারিলেন না। কিন্তু মাতামহের প্রভাবই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে আমরা বিশেষভাবে মূর্ত্ত হইতে দেখি। দার্জ্জিলিঙের কন্‌ভেন্টে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী ভাষা খানিকটা অধিগত করিলেন বটে, কিন্তু মাতৃভাষার

সহিত একপ্রকার সম্পর্কশূন্য রহিলেন। বিধাতার অব্যর্থ বিধানে তাঁহার জীবনের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইল একটি স্বপ্নে। দার্জ্জিলিঙের কন্‌ভেণ্টে থাকিয়া তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—এক কৃষ্ণকায় বিরাট্ মূর্ত্তি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং নিকটে আসিয়া সেই বিরাট্ পুরুষ শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে চাহিতেছে। এই কৃষ্ণকান্তি পুরুষের দিকে চাহিয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিলেন। বালকের ক্রন্দনশব্দে অভিভাবিকা 'নানে'রা ছুটিয়া আসিলেন; কিন্তু এইদিন হইতে শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাঁহার বাল্যকালোচিত ক্রীড়া-কৌতুকাদি এইদিন হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বদা এই ভীমকান্তি পুরুষের সম্বন্ধে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেন। তাঁহার মনে হইত—এই অন্ধকারময় পুরুষ তাঁহাকে হত্যা করিবে। তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের হস্তোত্তোলিত ছুরিকা কোনমতেই বুক পাতিয়া লইবেন না, এই দৃঢ় সঙ্কল্পে তিনি এই বয়স হইতেই চিন্তাশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তারপর ইংলণ্ডে আসিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের ড্রয়েট সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার নূতন পাঠজীবনের আরম্ভ। সাহেবের পিতামহীর সহিত তিনি প্রতিদিন গীর্জ্জায় উপাসনায় অভ্যস্ত হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনে ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু পাদ্রীর নিকট উপাসকমণ্ডলীর প্রতিদিন পাপস্বীকারোক্তি তাঁহার মনকে পীড়িত করিত। তাঁহার মুখেই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শুনিয়াছি—তিনি এই গল্পটি অতিশয় কৌতুকের সহিত বলিতেন—একদিন পাদ্রীরা তাঁহাকে পাপ স্বীকার করিতে বলায়,

তিনি কি যে বলিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। পরিশেষে কাঁদিতে-কাঁদিতে তিনি বলিলেন "চার্চ্চটি বহুদূরে থাকায় আমি প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইতে পারি না—অতএব আমি অপরাধী।" এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বিগলিত ধারায় তিনি ক্রন্দনরত হইলেন। পাদ্রীরা তাঁহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে-করিতে বলিলেন 'এই বালকের প্রার্থনার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ।' সকলেই সেদিন শ্রীঅরবিন্দের প্রশংসায় মুখর হইলেন। বাল্যকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এই কথাগুলি বলায়, তিনি সেই যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের পড়া সমাপ্ত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে আসিয়া সেণ্ট পল স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। পিতার যথারীতি আর্থিক সাহায্য তদীয় অনবধানতায় যথাসময়ে না আসিয়া পৌঁছায়, এই সময়ে তাঁহাকে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। কয়লার অভাবে বুকে হাঁটু দিয়া লণ্ডনের শীতে রাত্রিযাপন—আহারের জন্য দিনে এক টুকরা রুটি আর এক পাত্র চা, আর রাত্রে এক পেনীর একখণ্ড মাংস আর এক পাত্র চা—এই অবস্থায় কঠোর শ্রমে অধ্যয়ন করিয়া, পরে বিদ্যালয়ে উচ্চ বৃত্তি পাইয়া তাঁকে এই দারিদ্র্যক্লেশ কিছুটা দূর করিতে হইয়াছিল।

তিনি তরুণ বয়সে "Revolt of Islam" গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার উদ্দীপনা প্রান। ইহা ছিল তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ। তিনি সেণ্ট পল স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কেম্‌ব্রিজের আই-সি-এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। ভাগ্যের পরিহাসে যে বীচক্রফ্‌ট সাহেবের আদালতে তিনি ভবিষ্যতে আসামীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই বীচক্রফ্‌ট সাহেব ছিলেন তাঁহার সহপাঠী এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ তদপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার

করিতেন। বীচক্রফ্‌ট সাহেব এই সময়ে অধ্যয়ন ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

অনেকেই মনে করেন—শ্রীঅরবিন্দ অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় আই-সি-এস্ উপাধি লাভ করেন নাই; কিন্তু একথা সত্য নহে। আমি স্বয়ং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের স্বমুখনিঃসৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন:

"অশ্বারোহণ পরীক্ষা দিবার প্রাক্কালে আমি তন্ময় হইয়া যাই। এই সময়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দুইটী স্বপ্ন দেখি—প্রথমে বৃটেনের ভাগ্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার পাই। ভারত-সম্রাটের সিংহাসনের দিকে আমি অগ্রসর হইতে চাহিয়াছি: হাসিতে-হাসিতে তিনি আমায় অনেক শুভবাণী প্রদান করেন। তারপরই দেখি—ত্রিশূল হস্তে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। তিনি ভারত-সংস্কৃতির মন্ত্র দিয়া আমায় উদ্বুদ্ধ করেন। আমি ইঁহারই বাণী শ্রেয়ঃ করিয়া লই। অশ্বারোহণপরীক্ষায় আমি অনুপস্থিত থাকি। ইহার জন্য মেজদাদার তিরস্কার, কটন সাহেবের কটু ভৎসনা অনেক সহিতে হইয়াছে।"

শ্রীঅরবিন্দ আই-সি-এস পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণ তাঁহার অকৃতকার্য্যতা নহে, পরন্তু যাহা ঈশ্বর-বিধান, তাহাই তিনি অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ আরও দুই বৎসর কেম্‌ব্রিজে থাকিয়া "ক্লাসিক্‌স ট্রাইপজ" পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। এই দুই বৎসরকাল তিনি শুধু পড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকেন নাই। স্বপ্নে সেই সন্ন্যাসীর দর্শনলাভের পর হইতে তিনি ভারতের সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য ভারত সম্বন্ধে যে-কোনও গ্রন্থ পাইতেন, তাহাই পড়িয়া শেষ করিতেন।

তিনি কি জন্য জন্মিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহার নিকট ক্রমশঃ এইরূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি ভারতের বুদ্ধ ও

বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থগুলিও অধ্যয়ন করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কথাও তাঁহার কাণে আসিল। তিনি মনোযোগের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল কথা তৎকালে প্রকাশিত হইত, তাহা পাঠ করিতেন। তিনি আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণের নামও শুনিলেন। তাঁহার বাণীও মর্ম্মগত করিলেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ঠাকুর রামকৃষ্ণের মহিমা-প্রচারের উদ্যোগ করিতেছিলেন মাত্র। শ্রীঅরবিন্দ এই সকল সংবাদ মর্ম্ম দিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মনে হইত—ভারতের তত্ত্ব শুধু একজনের জীবন দিয়া প্রকাশিত হইবে না। অন্ততঃ শত-জন ভারত-সংস্কৃতির মহিমাপ্রচারে যদি একান্ত তৎপর হয়, তবেই ভারত জগৎ-সভায় তাহার সত্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। তিনি ভারত সম্বন্ধে যতই চিন্তা করেন, ততই এক প্রকার চেতনা হারাইয়া অনুভব করেন—কে যেন তাঁহার অন্তরবীণায় অনাহত ঝঙ্কার তুলিয়া বলিতেছে "অরবিন্দ, তুমিই ভারত-সংস্কৃতির কর্ণধার। তোমাকেই ভারতের মহাবাণী প্রচার করিতে হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের শাস্ত্র সম্বন্ধে সেকলের মন্তব্য নিরর্থক মনে করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভারত-সংস্কৃতির যত গ্রন্থ ছিল, সবই তিনি একে-একে নিঃশেষ করিলেন। অন্তরে প্রজ্বলিত হোমানল যেন তাঁহাকে ভারতের সত্যাবিষ্কারে ক্রমেই অধিকতর অনুপ্রাণিত করিল। তিনি একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় এই সময়ে ভারতে প্রত্যাগমনের সুযোগান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেম্‌ব্রিজে পাঠ শেষ করিয়াই তাঁহার ভারতাভিমুখে যাত্রা করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি পিতাকে 'কেবল্' করিয়া

ভারতে প্রত্যাগমনের জন্য অর্থাদি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ পিতাকে গ্রীণ্ড্‌লে কোম্পানীর নিকট অর্থপ্রেরণের কথা জানাইলেন। প্রতিদিন অর্থপ্রাপ্তির আশায় এই কোম্পানীর অফিসে শ্রীঅরবিন্দ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। জাহাজ ছাড়িল, কিন্তু কৃষ্ণধন-বাবুর অর্থ আসিয়া পৌঁছিল না। শ্রীঅরবিন্দ নিরাশ হইলেন না, ভারতের ধ্যানমগ্ন হইয়া তিনি সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গ্রীণ্ডলে কোম্পানীর একটি জাহাজ এই সময়ে জলমগ্ন হয়। কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার পুত্রগণ এই জাহাজেই আগমন করিবেন, এই-রূপ ধারণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। গ্রীণ্ডলে কোম্পানীও তাদের উত্তর দিয়া জানাইল—তাঁহার পুত্রগণ ঐ জাহাজেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কৃষ্ণধনবাবু এই সংবাদে শোকে একেবারে সংজ্ঞাহারা হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীঅরবিন্দ যথাসময়ে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। তিনি ভারতাত্মার বাণীমূর্ত্তি রূপে দেশে ফিরিবেন—এই চিন্তায় তাঁহার তনুমনপ্রাণ এই সময়ে এমনই ডুবিয়া থাকিত যে, পিতার মৃত্যু-বার্ত্তায়ও তাঁহার চোখে-মুখে কোনরূপ শোকচিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তিনি যেন এই সমস্ত ঘটনা হইতেই আপনার স্বরূপ-চৈতন্যকে পাওয়ার সমধিক প্রেরণা-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন—ভারতের জন্যই তাঁহার জন্ম। তিনি খাঁটি ভারত-বাসীরূপে ভারতের ঋতময় ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে-বাহিরে এই প্রস্তুতিই চলিতেছিল। তিনি ভারতের মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া কোথায় গিয়া কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্র নিরূপণ করিবেন, এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি স্থির করিলেন—

সর্ব্বাগ্রে বোম্বাই প্রদেশেই তিনি কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্যদেবতা তাঁহাকে বাংলাদেশেই কর্ম্ম সুরু করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা বাংলার গঙ্গাতটে ভারত-সংস্কৃতির জয়পতাকা প্রোথিত করিবেন। তাঁহার এই ধারণা দৃঢ় হইল যে, পবিত্র বঙ্গদেশই তাঁহার কর্ম্মভূমি হইবে এবং ভাগীরথীতটবর্ত্তী হুগলী জেলাই হইবে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে আবার এই সুরধুনীপ্লাবিত হুগলী জেলাকেই তিনি বাংলার হৃদয়কেন্দ্র বলিয়াছেন। তিনি এই কথা পুনঃ-পুনঃ আমাদের শুনাইয়াছেন—"হুগলী আমাদের বাংলার হৃৎপিণ্ড, আর সমগ্র ভারতের হৃদয়ভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ।" বাংলা-দেশের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের নূপুর-নিক্কণ শুনিয়াছি, হালিসহরে রামপ্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। এই দেশই রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি, এই ভাগীরথীতীরে কেশবচন্দ্রও জন্মিয়াছিলেন। কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্ম-পরিগ্রহ, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কীর্ত্তিধ্বজা। এই ভাগীরথীতীরেই স্বামী বিবেকানন্দের মঠপ্রতিষ্ঠা। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দেই শ্রীঅরবিন্দের এই দৃঢ় ধারণা—বাংলাই হইবে ভারতের তীর্থ।

শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তিনি ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই আপনাকে চিনিয়া লইলেন। এই সময় হইতেই শ্রীঅরবিন্দ নিজের জীবন সম্বন্ধে এক অলৌকিক তৃতীয়শক্তির প্রভাব ও প্রেরণা বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার জীবনের নিয়ামক আর তিনি ছিলেন না, ঈশ্বর ভিন্ন কেহ তাঁহাকে পরিচালিত করিতেও পারিত না। তিনি সেই তৃতীয় শক্তের সঙ্কেতেই এই সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করেন। নিদারুণ

অর্থকৃচ্ছতার যুগে ঈশ্বর-নির্ভরতার আশ্রয়েই লণ্ডনে তিনি ধৈর্য্য-সহকারে বাস করিয়াছিলেন। এই বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি এই তৃতীয় শক্তির সঙ্কেত-লাভ করিলেন। তিনি তৃতীয় শক্তিরই হস্তে যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, সেই সময়ে কুটন সাহেব আসিয়া বরোদার গায়কোয়াড়ের সংবাদ দিলেন। তিনি কটন সাহেবের পরিচয়পত্র লইয়াই বরোদার মহারাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। গায়কোয়াড় শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার পার্সোন্যাল সেক্রেটারী করিতে মনস্থঃ করিলেন। বেতন জিজ্ঞাসা করায়, অরবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া জানাইবেন, এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন। বড় ভাই বিনয়বাবু ছিলেন অতি অমায়িক লোক। শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজন অতি সামান্য; দুইশত টাকা বেতন হইলেই চলিয়া যাইবে, এই কথা বলায় শ্রীঅরবিন্দও গাইকোয়াড়কে এই কথাই জানাইলেন। বরোদার রাজা হাসিলেন। তিনি দুইশত টাকায় একজন আই-সি-এস্ কর্ম্মচারী পাইয়াছেন, এই কথা কৌতুক-ভরে বরোদার প্রধান সচিবকে জানাইলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর। তখন কে জানিত—শ্রীঅরবিন্দ-মধ্যে যে আগুন ধূমায়িত, তাহা ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে সারা ভারতে। কে জানিত বাংলার গঙ্গাতীরে জাত এই শিশু কৃষ্ণধন বাবুর যত্নে ও অধ্যবসায়ে মানুষ হইয়াও, পিতার অভিলাষ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বাংলার রত্ন-প্রদীপরূপেই পরিচিত হইবেন। কে জানিত—সেদিন শ্রীঅরবিন্দ ভারত-বিধাতার অব্যর্থ নির্দ্দেশে, ভাগবত শক্তিরই সঙ্কেতে আপনাকে নবজাতির নরদেবতা-রূপে গড়িয়া তুলিবেন? তাই না রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে বলিয়াছিলেন

"স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি"। কে জানিত—সেদিন "বন্দেমাতরমের" পাতায়-পাতায় ভারত-জাতীয়তার অগ্নি-বৃষ্টি করিয়া, অতঃপর তিনি ইংরেজের কারাগারকে তীর্থে পরিণত করিবেন? কে জানিত— "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিনে"র ছত্রে-ছত্রে স্বদেশজননীর বাণী এমন মধুর রবে মূর্চ্ছনা তুলিবে? "আর্য্য"-পত্রিকার পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় গীতার ভাষ্য, বেদের মর্ম্মবাণী, দিব্য-জীবনের পরিচয় দিয়া তিনি ভারতের প্রাচীন আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবেন? আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রথম জীবন-পর্ব্বের ইতিহাসটুকুই এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। ইহার পর ১৮৯৪ হইতে ১৯১০, তারপর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে ভারতের জাতীয়তাই বিগ্রহমূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

*

* *

॥ দুই ॥

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে পদার্পণ করিলেন। নূতন উৎসাহ ও অভিনব প্রেরণা লইয়া তাঁহার এই আগমন আমাদের নজরে পড়ে। তিনি যে বৎসরে বরোদারাজ্যে গাইক্বোয়াড়ের অধীনে প্রথম দুইশত মুদ্রা বেতনে কার্য্যভার লইয়া উপস্থিত হইলেন, সেই বৎসরেই ভারতের দুইজন মহাপুরুষ বিদেশযাত্রা করেন। একজন স্বামী বিবেকানন্দ—তিনি ভারতের সংস্কৃতির জয়ডঙ্কা বাজাইলেন আমেরিকায়। তাঁহার কণ্ঠে বেদান্তের সিংহ-গর্জ্জন শুনিয়া পাশ্চাত্ত্যে তুমুল ঝড় উঠিল। আর একজন মোহন-দাস করমচাঁদ গান্ধী—তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া জাতীয় জীবনে অপূর্ব্ব সাড়া তুলিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ দুইশত মুদ্রা বেতনে অধিকদিন চাকুরিয়া হইয়া থাকিলেন না, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া বরোদার গাইকোয়াড় অতিশয় প্রীত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদা রাজ-কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হইলেন। এই কর্ম্মে তাঁহার বেতন হইল মাসিক সাতশত টাকা। দক্ষিণেশ্বরের মর্ম্ম-বাণী তিনি পূর্ব্বে হইতেই অবগত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আত্মদানের

বিবরণ শুনিয়া তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের উপর। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করিয়া পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন. তাহার সংবাদ তিনি নিরতিশয় আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্ববিজয়ী করারই প্রেরণা বুকে লইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠের সেই বিজয়বাণী কতখানি কার্য্যকরী হয়, সেদিকে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার নিজের মনে হইত—'একদিন আমাকেই ভারতের মর্ম্ম-রক্ষার এই দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে।'

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের বাংলা নবজীবন লইয়া একদিন আবির্ভূত হইবে—এই ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল ছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহনের জন্ম। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বুকে ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সে যুগের নেতৃবর্গ বাংলায় ব্রহ্মমন্ত্রপ্রচারে উদ্যোগী হন। রাজা রামমোহন বাঙালী জাতিকে ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। বেদান্তের মন্ত্রধ্বনিতে তিনিই প্রথমে এ-যুগে বাঙালীর প্রাণ উদ্বুদ্ধ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই মহাবাণীরই অনুসরণ করিয়া জাতিকে উপনিষৎ ও গীতার ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতের বৃষ্টল সহরে রাজা রামমোহন দেহত্যাগ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জাতিকে ব্রহ্মমন্ত্র শুনাইতেন গীতা ও উপনিষদের বাণী উদ্ধার করিয়া। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেই আর এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন—তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্রই তাঁহার কথা সর্ব্ব প্রথমে বাহিরে প্রচার করেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দ এই মহা-পুরুষের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া অপার্থিব শক্তিলাভে ধন্য হন।

রামমোহনের ব্রহ্মমন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে সিদ্ধ হইয়াছিল, অধিকন্তু শক্তি-বাদের সহিত ব্রহ্মবাদের সেখানে সমন্বয় হইয়াছিল। তাই দক্ষিণেশ্বর নবীন বাংলার যুগতীর্থ। এই মহাতীর্থেরই পঞ্চবটীমূলে গভীর নিশীথে সর্ব্বদিক্ যখন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, ভাগীরথী যখন বহিয়া চলিয়াছিল চন্দ্রোদ্ভাসিত হীরক-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন "তুই ব্রহ্ম, আমি কালী—আমি ব্রহ্ম, তুই কালী।"

ব্রহ্মমন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে শক্তিমূর্ত্তি লইয়া কেমন অপরূপ যুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ব্রহ্মতত্ত্বই জাতিকে পরম জ্ঞান প্রদান করে। আর ব্রহ্মশক্তিই মহাকালীরূপে জাতিকে শক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনে এই ব্রহ্ম ও কালীর মর্ম্মানুভূতি যে কত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি লইয়া তাঁহার নব দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহা পরে বিবৃত হইবে। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বরোদার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া গভীর আত্মসাধনায় দিনাতি-পাত করিলেন। তাঁহার অন্তরের আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া জাতীয় জীবনে ভারতের অমর সংস্কৃতি কিভাবে কার্য্যকরী হইবে, তাহাই সতত চিন্তা করিতেন। এইজন্যই তিনি বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিতেন বিবেকানন্দের প্রতি। তাঁহার মনে হইত—স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠে যে মহাবাণী উচ্চারিত হয়, তাহা বোধ হয় অচিরেই শেষ হইবে। তারপর এই গুরুভার বহন করিবার জন্য বিধাতা তাঁহাকেই ভারতে আনিয়াছেন। কিন্তু এই অমর সংস্কৃতি যথার্থ ফলপ্রসূভাবে প্রচার করিতে হইলে, পরিপূর্ণ রাষ্ট্র-স্বাধীনতা জাতিকে অর্জ্জন করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার

অসাধারণ সাফল্য লাভ করিলেও, ভারতের পরাধীনতা-শৃঙ্খল-মোচন না হইলে, সনাতন ধর্ম্মে সর্ব্বজাতি প্রকৃত আস্থাসম্পন্ন হইবে না। তাই তিনি একাধারে রাষ্ট্র ও ধর্ম্মকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার জন্য বরোদায় আসিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানবাসী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গাইকোয়াড়ের সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এই বীর সৈনিকের বলবীর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীঅরবিন্দ অচিরে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন।

তারপর এই যতীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতার বৈপ্লবিক নীতি ও কর্ম্মসূচীর পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় বিশ্বের জাতিসমূহের নিকট শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় ও বরণীয় হইবে না, এই ধারণা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। তাই অতঃপর তিনি পুণার ঠাকুরসাহেবের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবান্দোলনে গুপ্তভাবে যোগ দিয়া, প্রকাশ্যে মহামতি তিলক ও খাপার্দ্দের সহিত ভারতের মুক্তিপ্রচেষ্টায় রত হইলেন। এই সময়ে বারীন্দ্রকুমারও ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন কার্য্যকরী করিবার ভার গ্রহণ করিয়া বাংলায় ফিরিলেন। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। এখন বারীন্দ্র আসিয়া যতীন্দ্রনাথের সঙ্গী হইলেন। এইভাবেই শ্রীঅরবিন্দের জীবনের নূতন পর্ব্ব আরম্ভ হইল।

বাংলায় বিপ্লবের প্রেরণা সেদিন অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

আমি তাঁহার মুখে পরে শুনিয়াছি যে, মিঃ পি-মিত্রের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরলোকগত গিরিশচন্দ্র বসু ও অন্যান্যের অনুরোধে তিনি ভূপালচন্দ্র বসুর কন্য মৃণালিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন· বাবু ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। অতএব শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন ব্রাহ্ম। কিন্তু ভূপালচন্দ্র বসু গোঁড়া হিন্দু বলিয়া এই বিবাহে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ শুনিয়াছিলেন—মৃণালিনী দেবী তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই পতিত্বে ববণ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার পাণিগ্রহণেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই বিবাহ হিন্দুমতেই সম্পন্ন করার জন্য তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিবার কথা উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে গোময় ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ হওয়ার বিধান দিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মমতের অনুবর্ত্তী বলিয়া তিনি যে কিছু পাপ করিয়াছেন, এমন ধারণা তাঁহার মনে স্থান পায় না। হিন্দু নাম লইলে যদি পরিণয়-কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়, তিনি তাহার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু ব্রাহ্মসম্প্রদায় হিন্দু হইতে ভিন্ন নহে।"............

ভূপালচন্দ্র বসুর আত্মীয়েরা শ্রীঅরবিন্দকে অনেক বুঝাইলেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান যুক্তিসঙ্গত, অতএব তাঁহাকে গোময় লইয়া বিশুদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু তিনি কোনমতেই ইহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পবিত্র গঙ্গাবারিস্পর্শেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইল। অতঃপর তিনি ভূপালবাবুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে বাংলায় বৈপ্লবিক কর্ম্মের সূচনা করিতে গিয়া বারীন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্রনাথের মধ্যে বিবাদ বাধিল। দুইজনের মধ্যে

পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। স্বাধীনতার সাফল্যলাভের সঙ্কল্পে উভয়েই দৃঢ়চিত্ত হইয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুইজনের মধ্যে মতানৈক্য-সৃষ্টি হওয়ায়, বিপ্লবকর্ম্মে তাঁহারা অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইলেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য বরোদা হইতে শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় পুনঃ-পুনঃ আগমন করেন। কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের সহিত যতীন্দ্রনাথের সংযোগ-স্থাপন কোনমতেই সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি নিরাশ হইলেন। তারপর আসিল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট। লর্ড কার্জ্জন বঙ্গভঙ্গে দৃঢ় সঙ্কল্প হওয়ায়, বাংলার নেতৃবর্গ টাউন হলের সভায় ইহার প্রতিবাদে বয়কট-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

ইহার পর বাংলায় ইংরেজবিদ্বেষের বন্যা বহিল। শ্রীঅরবিন্দ এই সূত্রে বারীন্দ্রকুমারকে বিপ্লবান্দোলনের কত বড় সুযোগ আসিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া পত্র দিলেন। বারীন্দ্রকুমারও বাংলার বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বঙ্গভঙ্গান্দোলনের সুযোগে নূতন আয়োজনে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ এতদিন তিলক ও খাপার্দ্দের সহিত ভারতব্যাপী বিপ্লবান্দোলনের পরামর্শ করিতেছিলেন। মহামতি তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে শক্তিশালী বৈপ্লবিক দলও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাংলায় বর্ত্তমান সুযোগে এই বিপ্লব-যজ্ঞ সমধিক কার্য্যকরী হইবে, এই ধারণা লইয়া শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ফিরিলেন এবং নবগঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া বাংলার তরুণদের প্রাণে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া তুলিতে উদ্যোগী হইলেন। বারীন্দ্রকুমারও নূতন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। বরোদার গায়কোয়াড়

আসিয়া শ্রীঅরবিন্দকে ফিরাইয়া লওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ উচ্চপদপ্রার্থী হইয়া অর্থলালসায় ভারতে প্রত্যাগমন করেন নাই, তিনি এখন বাংলার নিজস্ব পথে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বরোদার মহারাজা হতাশ হইয়া ফিরিলেন। বরোদার কর্ম্মে তিনি প্রতি মাসে সাত শত টাকা বেতন পাইতেন, বাংলার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদে মাসে মাত্র দেড়শত টাকা বেতনে তিনি কর্ম্ম লইলেন! জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গতির অভাবে সে বেতনও তিনি যথাসময়ে পাইতেন না। বাংলার উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়কে স্বাধীনতার পথে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই তিনি এই কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। তারপর জাতীয় সংবাদপত্র ইংরাজী "বন্দেমাতরমের" প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার আহ্বান আসিলে, সে আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। জাতীয় বিদ্যালয় হইতে "বন্দেমাতরম্" পত্রের মাধ্যমে জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে জাতীয়তার বাণীপ্রচারের অধিকতর সুযোগ দেখিয়া, তিনি ইহাতেই আত্মনিয়োগ করিলেন, অর্থোপার্জ্জনের লালসা তাঁহার কোনদিনই ছিল না। তিনি স্বদেশ-যজ্ঞের হোমানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন 'বন্দেমাতরম্' পত্রে অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধমালার ভিতর দিয়া। সে যুগে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের তরুণদের যে বাণী শুনাইতেছিলেন, "বন্দেমাতরমের" লেখায় তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, জাতীয়তার বহ্নিশিখায় বাঙালী জাতি বিশুদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সে যুগের কথা স্মরণ করিলে আজিও আমাদের হৃদয় পুলকোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিদায়াভিনন্দনের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন :

"Whatever respect you have shown to me today was shown not to me, not merely even to the Principal, but to your Country, to the Mother in me, because what little I have done has been done for Her........."

তিনি আরও বলিয়াছিলেন :

"When we established this College, and left other occupations, other chances of life, to devote our lives to this institution, we did so, because we hoped to see in it the foundation, the nucleus of a nation, of a new India which is to begin its career after this night of sorrow and trouble, on that day of glory and greatness, when India will work for the world."

ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

"I wish to see some of you becoming great, great not for your own sake, not that you may satisfy your own vanity, but great for Her, to make India great, to enable Her to stand up with head erect among the nations of the earth, as She did in days of yore, when the world looked up to Her for light."

এই ছিলেন সেদিনের শ্রীঅরবিন্দ।

অতঃপর "বন্দেমাতরমের" স্তম্ভেও তাঁহার লেখনীমুখে অগ্নি-বর্ষণ সুরু হইল। আমরা উক্ত পত্র লইতে কয়েক ছত্র তুলিয়া ইহার নিদর্শন দেখাইতেছি :

"......But are you quite sure that no voice will be raised in India—do you feel confident enough that for every Nationalist that you hurry into prison, you will not call into life Nationalists by the hundred

thousand, who will take the vow before their God to live and work for the day when the punishment of the Nationalist shall be the only pass-port of glory, honour, worship, the only deliverance from death ?"

শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লব-কর্ম্মীরা উদ্বুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা বিপ্লব-কর্ম্মে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে ছুটিলেন। মাণিকতলার বাগানে বোমানির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল। উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন ইহার মূলে, তাঁহাদের সকলেরই নাম অগ্নিময় অক্ষরে জাতীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে—এখানে নূতন করিয়া তাহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীঅরবিন্দের লেখনীও এই বিপ্লবীদের কর্ম্মে জাতিকে অভিনব প্রেরণা দিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বরিশাল কন্‌ফারেন্স লইয়া বাংলায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন সাহেবের আদালতে সুরেন্দ্রনাথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলেন। বরিশালের সভা পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেবের দৌরাত্ম্যে ভাঙ্গিয়া গেল। পথে চলিল পুলিসের লাঠি। নেতৃগণের শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্"-ধ্বনি উঠিল গগন বিদীর্ণ করিয়া। তাঁহার মাথায় লাঠি পড়িল ভীমবেগে। পার্শ্বের পুষ্করিণীতে পড়িয়া তিনি নিমজ্জিতপ্রায় হইলেন। পিতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সন্তানের এই বীরত্ব সগৌরবে সমর্থন করিলেন। বরিশালের সংবাদে বাঙালীর তন্দ্রা দূর হইল। উৎসাহের আগুন ধু-ধু করিয়া জ্বলিল।

অগ্নিবাণী লইয়া "যুগান্তর" বাহির হইল। "নবশক্তি" ও "সন্ধ্যা" সঙ্গে-সঙ্গে নবমন্ত্রপ্রচারে মুখর হইল। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ এক বৎসরের জন্য যুগান্তরেব মামলায় কারাগৃহে প্রেরিত হইলেন। সুশীল সেনের উপর বেত্রাঘাত হইল। ঘটনার পর ঘটনায় আগুন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় জাতি বিপ্লব-কর্ম্মে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইল। বরিশালের পরেই বাংলায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা দিল নরমপন্থী এবং চরমপন্থী—দুইটি দল।

বিপিনচন্দ্রকে পুরোভাগে লইয়া শ্রীঅরবিন্দ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব চরমপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নরমপন্থী আদর্শ লইয়া জাতিকে শনৈঃ-শনৈঃ স্বাধীনতার বৈধ পথে চলিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। তার পরে আসিল কলিকাতার কংগ্রেস। চরমপন্থী দল চাহিলেন—মহামতি তিলককে এই মহাসভার অধিনায়ক-রূপে। বাংলার নরমপন্থীরা প্রমাদ গণিলেন, তাঁহারা ডাকিয়া আনিলেন বিলাতপ্রবাসী বৃদ্ধ রাজনীতিবিশারদ দাদাভাই নৌরজীকে। চরমপন্থীরা নীরব হইলেন। বাংলার স্বাধীনতা প্রেরণা দাদাভাই নৌরজী একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহারই কণ্ঠে প্রকাশ পাইল "স্বরাজ"-মন্ত্র। তিনি ঘোষণা করিলেন —"স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য"। এই স্বরাজের জন্য চাই স্বদেশী ও বয়কট। এই স্বরাজ-স্বপ্নকে সার্থক করিতে হইবে জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-দ্বারা। তরুণদের চরিত্র ইহাতেই গড়িয়া উঠিবে।

স্বরাজের ব্যাখ্যা লইয়া বাংলায় গোল বাধিল। নরমপন্থীরা স্বরাজের অর্থ করিলেন—স্বায়ত্তশাসন। শ্রীঅরবিন্দ স্বরাজকেই "পূর্ণস্বাধীনতা" আখ্যা দিয়া বিদেশীয় রাজশক্তির উচ্ছেদ চাহিলেন।

বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীণ নেতাদের প্রভাব কমিল। সুরাটের দক্ষযজ্ঞে ইহার চরম পরিণতি দেখা দিল। সুরাটেও সভাপতিত্ব লইয়া চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিল। ফলে সভাভঙ্গ হইল। বাংলায় ফেরার পথে শ্রীঅরবিন্দ বোম্বাইয়ের সভায় বলিলেন :

"What is Nationalism? Nationalism is not a mere political programme. Nationalism is a religion that has come from God."

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

"If you are going to be a Nationalist, if you are going to accept this religion of Nationalism, you must do it in the religious spirit. You must remember that you are the instruments of God. .... This thing is happening daily in Bengal; because in Bengal, Nationalism has come to the people as a religion, and it has been accepted as a religion...... It always happens when a new religion is preached, when God is going to be born in the people, that such forces rise with all their weapons in their hands to erush the religion... Nationalism has not been crushed... ...Nationalism is immortal......God cannot be killed, God cannot be sent to jail ...Do you hold your political creed from a higher source? Is it God that is born in you? Have you realised that you are merely the instruments of God, that your bodies are not your own? You are merely instruments of God for the work of the Almighty. Have you realised that?"

বাঙালীর প্রাণে এই জাতীয়তার বন্যা আসিয়াছিল—বাঙালী জাতি ঈশ্বরের প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—ঈশ্বরই সব কিছুরই নিয়ামক—এই বিশ্বাসেই সেদিন সে অগ্রসর হইয়াছিল। এইজন্য বোম্বাইয়ের সভায় শ্রীঅরবিন্দ আরও বলিয়াছিলেন :

"If anybody had told you that Bengal would come forward as saviour of India, how many of you would have believed it? You would have said "No. The saviour of India cannot be Bengal, it may be Maharastra, it may be the Punjab, but it will not be Bengal; the idea is absurd. What has happened then? ......In Bengal there was an element of strength. Whatever the Bengalee believed, if he believed at all—many do not believe—but if they believed at all, there was one thing about the Bengalee that he lived what he believed ......The Bengalee has the faculty of belief. Belief is not a merely intellectual process, belief is not a mere persuasion of the mind, belief is something that is in our heart; and what you believe you must do, because belief is from God....... In Bengal there has come a flood of religious truth."

"......When the intellect ceased to work, the heart of Bengal was open and received the voice of God, whenever He should speak. When the message came at last, Bengal was ready to receive it and she received it in a single moment and in a single moment the whole nation rose, the whole nation lifted itself out of

delusions and out of despair and it was by this sudden rising, by this sudden awakening from dream that Bengal found the way of salvation and declared to all India that enteral life, immortality and not lasting degradation was her fate. Bengal lived in that faith."

অতঃপর আলিপুর বোমার মামলায় তিনি কিভাবে দিনাতিপাত করিলেন? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তাঁর মামলা-পরিচালনার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বলিয়া তিনি চিনিলেন। আদালত হইতে জেলের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর মধ্যেও তিনি নারায়ণ দর্শন করিলেন। দেবী মৃণালিনীকে এই সময়ে তিনি যে সকল পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার এই নূতন অনুভূতিমূলক আদর্শবাদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আদালতে দেশবন্ধু এই সকল পত্র উপস্থাপিত করেন সেই পত্রগুলি হইতেই আমরা জাতীয়তার মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দকে চিনিয়া লইব :

১

আমার তিনটী পাগলামী আছে ; প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রহিল, ভগবান্‌কে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্র বলে, যে ভগবানের নিকট হইতে ধন লইয়া ভগবান্‌কে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া

হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরিয়া কৃতার্থ হয়।

আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি—ইহা বুঝিতে পারিলাম, বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। —আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবান্‌কে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়াছি তার জন্যে কোন অনুতাপ নাই, পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিয়ে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া-পরিয়া, যাহা সত্যি-সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবান্‌কে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বল্‌ছিলে 'আমার কোন উন্নতি হল না'—এই উন্নতির একটা পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

২

দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে. পাগলামীটা এই, যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে আজ-কালকার ধর্ম্ম—ভগবানের নাম কথায়-কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা

আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে সে পথ যতই দুর্গম হোক্, আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে—নিজের শরীরের মধ্যে নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে-পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কে তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে, তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

৩

তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়িয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজঃ একমাত্র তেজঃ নহে,

ব্রহ্মতেজঃও আছে, সেই তেজঃ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান্ এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসীর কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে—'কোথাকার বদলোক আমার সরল ভালমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে।' তোমার ভালমানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত-শত লোককে সেই পথে, কুপথ বা সুপথ হোক্, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র-সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।"

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে মুক্তিলাভ করেন। বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির ফাঁসীর কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলেন "তোমাদের মৃত্যুদণ্ড অসম্ভব।" এক বৎসর জেলে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—ইহা তিনি সদ্যোমুক্ত হইয়া উত্তরপাড়ায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। তিনি কি ভাবে ঈশ্বরের বাণী লাভ করিয়াছিলেন, উত্তরপাড়ার সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় তাহা ব্যক্ত করিয়া বলেন:

"...Then he placed the Gita in my hands. His strength entered into me and I was able to do the Sadhan of the Gita. I was not only able to understand intellectually but to realise what Sree Krishna

demanded of Arjuna and what He demands of those who aspire to do His work ....."

তারপরই তিনি বলিতেছেন :

"......I realised what the Hindu religion means....."

তারপর স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব বা নারায়ণ মূর্ত্তিতে কি ভাবে সর্ব্বভূতে সর্ব্ব জীবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া শ্রীঅরবিন্দকে এই মর্ম্মে বলিতেছেন :

"I am raising up this nation to send forth My word. This is the Sanatan Dharma. This is the eternal religion which you did not really know before but which I have now revealed to you."

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং ধর্ম্মকে পরিপূর্ণভাবে অধিগত করিয়া আপূর্য্যমাণ প্রাণে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করিলেন :

'I said then that this movement is not a political movement and that Nationalism is not politics, but a religion, a creed, a faith. I say it again to day, but I put it in another way. I say no longer that Nationalism is a creed, a religion, a faith. I say that, it is the 'Sanatana Dharma" which is for us Nationalism. This Hindu nation was born with the "Sanatan Dharma"—with it, it moves and with it, it grows ; when the Sanatan Dharma declines, then the nation declines, and if the Sanatan Dharma were capable of perishing, with the Sanatan Dharma it would perish. The Sanatan Dharma—that is Nationalism."

অতঃপর তিনি বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে পুনর্ব্বার নূতনভাবে কার্য্য

আরম্ভ করিলেন। তাঁহার "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" যথাক্রমে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বাহির হইল। তাঁহার উদ্দেশ্যের কথা এই দুই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এইখানে প্রকাশ করিব। শ্রীঅরবিন্দকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করিব, তাহারই আভাস কি নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য হইবে? ইংরাজী "কর্ম্মযোগিনে" তাঁহার এই সুস্পষ্ট মতবাদ ঘোষিত হইল:

"......Whatever nation is the first to solve the problems which are threatening to hammer Governments, creeds, societies into pieces, will lead the world in the age that is coming. It is our ambition that India should be that nation. In order that she should be that, she should be capable of unsparing revolution. She must have the courage of her past knowledge and immensity of soul, that will measure with our future. This is impossible to England. It is not impossible to India. She has something demoniac, volcanic, elemental; She can rise above conventions; She can break through formalities and prejudices But she will not do so, unless She is sure that She has God's command to do it, unless the 'Avatara" descends and leads. It is a little of that demoniac, volcanic, elemental thing in the heart of the Indian, which Lord Curzon lashed into life in 1905. But that awakening was too narrow in its scope too feebly supported with strength, too ill-informed in knowledge. Above all the "Avatara" had not descended. So the movement

had drawn back to wait a further and truer impulse. Meanwhile let it inform its intellect and put more iron into its heart awaiting a diviner manifestation."

"ধর্ম্মে"ও তিনি লিখিলেন :

"স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান। অনেকে স্বায়ত্ত-শাসন বলেন, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন, আর্য্যঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একটীমাত্র অঙ্গ। তাহার দুই দিক্ আছে—বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি—বাহ্যিক স্বাধীনতা। প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন পরের শাসন ও রাজত্ব থাকে, ততদিন কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলে না। যতদিন প্রজাতন্ত্র-সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য।"

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দর্শন পাই আলিপুর জেলে। কানাইলালের সহিত বিপ্লবের ষড়যন্ত্রচ্ছলে বহুবার এই ক্ষেত্রে আমাকে উপস্থিত হইতে হয়। জেলে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন। কানাইলাল শ্রীঅরবিন্দের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়া আমায় চিনাইয়া দিল। "বন্দেমাতরমের" ঋষি শ্রীঅরবিন্দ—নবীন ভারতের দ্রষ্টা ও

স্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া সেইদিন ধন্য হইয়াছিলাম। ইহার পর তাঁহাকে আবার দর্শন করি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে, চুঁচুড়ায় প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে। নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হইলে চরমপন্থীদের পক্ষ লইয়া আমাদের দাঁড়াইতে হইবে, চন্দননগর গুপ্ত সমিতির নিকট এই আদেশ আসিয়াছিল। সেই সভায় শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুনিলাম। তিনি নরমপন্থীদের প্রস্তাবগুলি সুকৌশলে স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কোন সংঘর্ষ হইতে দিলেন না। শান্তচিত্তে বাড়ী ফিরিলাম। সংবাদপত্রে কলিকাতার উচ্চ আদালতের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সামসুল আলমের হত্যা বিবরণ পাঠ করিলাম। শ্রীঅরবিন্দের সহিত এই হত্যাকারীর প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, এই কর্ম্মের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহিত তাঁহার সম্পর্ক থাকায়, পুলিসের সন্ধানী দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দও দায়ী হইলেন। ইহার পর ভগিনী নিবেদিতার সতর্ক-বাণীর অনুসরণ করিয়া তিনি চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৯১০ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে জাতীয় সাধনার অনল-বিগ্রহ শ্রীঅরবিন্দ, তাঁহার ভাব ও ভাষামূর্ত্তি আমার হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

*

* *

॥ তিন ॥

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দের দেহাবসান হয়। ইহার বৎসর-কাল পরে শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে স্বামী নিরালম্ব) সহিত বারীন্দ্রকুমারের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সার্থক হইতেছে না দেখিয়া, একবার বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনের মূল সূত্রের অন্বেষণ দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙালী জাতির পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের সহিত শ্রীঅরবিন্দের জীবন যে সমসূত্রে গ্রথিত, ইহা তলাইয়া না বুঝিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার এই যুগ-পর্ব্বটী চির অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। বেদান্তের কেশরীগর্জ্জন তুলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রস্থান করিলেন। অল্পকাল পরে শ্রীঅরবিন্দ সব্যসাচীর ন্যায় বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীবিবেকানন্দ ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম ভারতেরই ধর্ম্ম ভারতেরই সনাতন যোগতত্ত্ব। শ্রীঅরবিন্দ একাধারে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র দুইকে আশ্রয় দিলেন; রাষ্ট্রসাধনাও যে রাজ-ধর্ম্ম। ভারতের স্বাধীনতা অভিনব উপায়ে আসিবে—মহাত্মা বিষ্ণু ভাস্কর লেলে তাঁহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্তরসাধনা ধীরে-ধীরে অধ্যাত্ম-যোগপথে সেই সময় হইতেই মোড় ফিরিতে আরম্ভ করে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী সামসুল আলামের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ ধৃত হন। ২০শে ফেব্রুয়ারী বীরেন্দ্রের গুরু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বন্দী হইয়া ইংরাজের আদালতে অভিযুক্ত হন। বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসী হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী। শ্রীঅরবিন্দ ২১শে ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। যতীন্দ্রনাথ প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দকেও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত করার প্রয়াস হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অতঃপর "কর্ম্মযোগিনে"র প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। সেই প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহা "An open letter to my countrymen" শিরোনামায় প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীঅরবিন্দের "Last Political Will and Testament" বলিয়া জাতীয়তাবাদিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। তদানীন্তন বৃটিশরাজ ইহা রাজদ্রোহমূলক বোধে প্রবন্ধলেখক শ্রীঅরবিন্দ ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন। নিম্ন আদালতের বিচারে মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের দণ্ড হয়। কিন্তু উচ্চ আদালতের বিচারে তিনি বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। উপরন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক নহে বলিয়া উচ্চ আদালতের বিচারপতি রায় প্রদান করেন। কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দের সহিত প্রায়ই ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎকার হইত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও অনেক সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার মুখেই তাঁহাকে পুনরায় ধরিবার আযোজনের কথা শ্রবণ করেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে

কোনও বিদেশী রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ দেন পরে নিজ অন্তর-বাণী পাইয়া উক্ত প্রস্তাব তিনি সিদ্ধান্তরূপে বর করিয়া লন। রামচন্দ্র মজুমদার 'ধর্ম্ম' ও 'কর্ম্মযোগিন্' অফিে শ্রীঅরবিন্দের সহকারীরূপে কাজ করিতেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আহিরীটোলার ঘাটে এক পান্সী ভাড়া করিয় তাঁহার অজ্ঞাতবাসের প্রাথমিক ব্যবস্থা কবিয়া দেন। সঙ্গী হ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সম্ভবতঃ আর একজন।

রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বেই চন্দননগরের রাণীর-ঘাটে তাঁহার নৌক আসিয়া পৌছিয়াছিল। শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের নিকট সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্ত মারফৎ তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরিত হয়। চারুচন্দ্র আমাদে লইয়া সম্প্রতি সারস্বত উৎসব-সমাপনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন সামসুল আলমের হত্যার পর চন্দননগরে এই প্রসিদ্ধ সারস্বত উৎসব সম্পন্ন হওয়ায়, বিপ্লবিগণ এই কার্য্য চারুবাবুর অতীত বিপ্লবকর্ম্মের উপর চূণকাম করার নীতি বলিয়া রহস্য করিয়া ছিলেন। মনে হয়—চারুচন্দ্র জেল হইতে ফিরিয়া স্বদেশসাধনে সাংস্কৃতিক পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সারস্বত উৎস তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক শ্রীঅরবিন্দের আত্মগোপন ব্যাপারে চারুবাবু আর কোনও দায়ি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দে থাকা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই সুরেশচন্দ্রকে ফিরাইয়া দেন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ কানাইলাল দত্তের অতি নিকট বন্ধু। এ দুইজনেই চারুচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই ক চারুচন্দ্র রায়ের মুখে শুনিয়া অতি দ্রুত আমার নিকট আসি উপস্থিত হন। আমি তাঁহার কাছে সব কথা শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দে

াামার বাড়ীতেই আশ্রয় দিই। এই কথা অনেক ক্ষেত্রে উক্ত 'ওয়ায়, তাহা আর এখানে বিস্তৃত করিয়া বলার প্রয়োজন বোধ ঃরি না। আমার ন্যায় একজন অপরিচিত মানুষের হাতে শ্রীঅরবিন্দকে রাখিয়া সুরেশচন্দ্র ও নলিনীকান্ত যেরূপ নিশ্চিন্তচিত্তে বিদায় লইয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যয় মামার উপর কতখানি হইয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপন করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন এবং কোথায় ভবিষ্যতে যাইবেন, তাহা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই বাস করিতে চাহেন। ইহাই আমার রাজনৈতিক বিপ্লবীদের চন্দননগরে আশ্রয়দানের প্রথম দীক্ষাস্বরূপ হয়। শ্রীঅরবিন্দ আমার বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলেন, তাঁহার অনুরাগের স্পর্শ আমি পাইয়াছিলাম। লোক-জানাজানির ভয়ে তাঁহাকে কয়েক-বার স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিতে হইয়াছে। তিনি একরাত্রি আমার এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে তাঁহারই বাড়ীতে বাস করেন, কিন্তু একরাত্রি বাসের পরই বিরক্ত হইয়া পরদিনই আমার ভবনে চলিয়া আসেন। তারপর গোন্দলপাড়ার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহাকে রাখিয়া আসি ; সে বিবরণ অতিশয় বিচিত্র।

কেমন করিয়া নিজের আস্তাবল হইতে গাড়ী-ঘোড়া বাহির করিয়া নিজেই চালক হইয়া গাড়ী ছুটাই, তাহার বৃত্তান্ত আমার "জীবন-সঙ্গিনী" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। গোন্দলপাড়া হইতে ফটকগোড়ায় করের বাগানেও তাঁহাকে কিছুদিন রাখা হয়। সেখানে বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই হইয়াছিল। তিনি আমায় অধ্যাত্ম-সাধনার কথাই শুধু বলিতেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেন। আমার

অন্তরের প্রবণতা কোন্ দিকে, শ্রীঅরবিন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনায়ই তিনি আমায় উদ্বুদ্ধ করিতেন।

গোপনে রাখার দায়িত্ববোধে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহাকে লইয়া আসা হইত। করের বাগানের পর আমারই বাড়ীর নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীখানি ছিল, তাহা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বশেষে সেখানে গোপনে রাখা হয়। সেখানে তাঁহার দেখাশুনার জন্য এই সময়ে বিপ্লবী সুদর্শন চক্রবর্ত্তী নামে এব তরুণ যুবককে লইযা আসা হয়। সুদর্শন কলে চাকুরী করে বলিয়া এই বাড়ী ভাড়া লয়। প্রত্যহ প্রাতঃ ৯টা বাজিলে সে সদর দরজায় তালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিত। শ্রীঅরবিন্দ সারাদিন এইখানে বন্দী থাকিতেন। এই সময়ে তিনি আহার করিতেন কিস্‌মিস্, বাদাম আর পেস্তা। সারাদিন বন্দিজীবনের পর রাত্রে চন্দননগরের বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের এই অজ্ঞাতবাস-কালের তিনটি ঘটনা আমার মনে বিশেষভাবে আঁকা আছে।

আমার বাড়ী হইতে তিনি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে গোন্দল-পাড়ায় প্রস্থান করেন। এই কয়দিন আমি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার প্রাণপণ প্রয়াস করি। কিন্তু একজনের নিকট তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই কথাই এখানে ব্যক্ত করিতেছি।

সে সময়ে আমার বাড়ীর কয়েকটি অব্যবহার্য্য গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতাম। একদিন ইহা ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। আমি শ্রীঅরবিন্দকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রাখিয়া আমাদের চেয়ারের

ারখানায় আসিলাম। তাঁহাকে সে যুগে দেখিয়াছি আত্ম-
ভালা শিবের ন্যায়। তিনি চলিতেন—যেন মাটিতে পা পড়িতেছে
া। যখন তিনি খাইতেন, তাহাও শব্দহীন। হাত-পা নড়িতেছে;
কিন্তু আর কে যেন তাহার নিয়ন্তা। শ্রীঅরবিন্দকে আনিয়া অবধি
এইরূপ আত্মহারার ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি এই সময়ে
আত্মসমর্পণযোগের কথাই বলিতেন। নিজের হাতখানি উপরের দিকে
উঠাইয়া তিনি বলিতেন 'তুমি মনে করিও না যে, আমি হাতখানি
উঠাইতেছি, আমার মধ্যে কোন এক তৃতীয় শক্তি কাজ করিতেছে।
আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহার
অপর্ব্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতাম—তিনি আর ইহজগতের
মানুষ নহেন; শুধু দেহটা এই বিশ্বে বিচরণ করে ভগবানেরই
উদ্দেশ্য-সাধনে। সেদিন তাঁহার চোখের দৃষ্টি আরও অপলক।
আমি তাঁহার অপরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নতশিরে তাঁহার
নিকট আসিয়া বসিলাম। ভুলিয়া গেলাম—তাঁহার স্নানের সময়
হইয়াছে। এই ঘরেই তাঁহাকে স্নান করাইতে হইবে। নতুবা
কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িলে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার এত প্রয়াস
াব ব্যর্থ হইয়া যাইবে যে! শ্রীঅরবিন্দের মুখে বাণী সরিল—তিনি
আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মতি, আমার কালীদর্শন হইয়াছে।
আজ মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি।"

এইদিন হইতে শ্রীঅরবিন্দ আমার নিকট "কালী" রূপে পরিচিত।
তাঁহার বহু পত্রের শিরোদেশে "Dear M", তাহার পর পত্র
শেষ করিয়া "A. G"র পরিবর্ত্তে "Kali" এই শব্দটি লিখিতেন।
তখনও বুঝি নাই যে, শ্রীঅরবিন্দ এই "কালী"-সাধনায় সিদ্ধিলাভের
পথে যাত্রা ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতেই সুরু

করিয়াছিলেন। এদিকে আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র পত্নীর মুখে শুনিয়াছিলাম—তিনি ঘুরিতে-ঘুরিতে চেয়াব-বোঝাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে চেয়ার সাজানো। তাহার মধ্যে অরবিন্দের আসন পাতা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে সেইখানে উপবিষ্ট ছিলেন, চেয়ার-সরানোর শব্দে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। আমার স্ত্রী তখন অসম্বৃতা। তাঁহাব হাতে সম্মার্জ্জনী ছিল। তিনি অকস্মাৎ এই গৃহ-মধ্যে এক পুরুষ-মূর্ত্তিকে দেখিয়া সলজ্জ বিস্ময়ে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নির্ণিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকেন। আমার স্ত্রী এইভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া পরক্ষণেই সসঙ্কোচে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হন। এই গোপনতার ব্যবস্থা যে আমারই কীর্ত্তি, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সব কথা শুনিয়া তিনি অতঃপব শ্রীঅববিন্দের সেবায় অকুণ্ঠা হইয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দেরই অনুরোধে সস্ত্রীক পণ্ডিচারী যাই। সে কথা পবে বলিব।

দ্বিতীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। বাল্যকাল হইতেই কিছু-না-কিছু লেখার আমার অভ্যাস ছিল। তখন সবে "উদ্বোধন" নাটকখানি লিখিয়া একরাত্রে বাড়ীতেই আমরা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া তাহা অভিনয় করিয়াছিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দিব্য সম্বন্ধের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আত্মসমর্পণ যোগের কথাই এই নাটকে আমি লিখিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আগা গোড়া তাহা শুনিলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া তিনি বলিলেন "তোমার লেখার অভ্যাস আছে, আমার ইচ্ছা 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় তুমি নিয়মিত ভাবে লিখিবে।" রামচন্দ্র মজুমদার তখন সাপ্তাহিক

'ধর্ম্ম" পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশে আমি "ধর্ম্মে" লিখিতে আরম্ভ করি। রামচন্দ্র হয়তো মনে করিতেন লেখাগুলি শ্রীঅরবিন্দের, বস্তুতঃ লেখার নূতন প্রেরণা শ্রীঅরবিন্দই আমায় প্রদান করেন।

এইবার সর্ব্বশেষ ঘটনার কথাই বলি। অজ্ঞাতবাসের শেষের দিকে আমার বাড়ীর অতি নিকটেই তিনি বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি বেশী দেখা-সাক্ষাৎ করতিাম না, নিজের সাধন-ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার সকল প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্বটুকুই আমার ছিল, সুদর্শনের মধ্য দিয়া তাহা যথারীতি সম্পন্ন করিতাম। একদিন শ্রীঅরবিন্দ আমায় ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রে তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "তুমি কেমন আছ?" আমি সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তখন ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার দিকেই আমি অধিক ঝোঁক দিয়াছি। সংযমের মাত্রা যেন আর রক্ষা হয় না! অন্তর-দর্শী শ্রীঅরবিন্দ যেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি আমার অবস্থার কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। তিনিও আমায় অনেক উপদেশ দিলেন—তারপর ধীরে-ধীরে বলিলেন "আমি কালই চলিয়া যাইতেছি। শ্রীশচন্দ্র কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তোমাকেও কিছু-কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।"

আমি শুনিলাম—তিনি পণ্ডিচারী যাইবেন। পণ্ডিচারী ফরাসী রাজ্যের রাজধানী। সেখানে তিনি নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। কিন্তু বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া গেল; দেড়মাস তিনি ছিলেন, হৃদয় যেন পূর্ণ থাকিত। অকস্মাৎ তাঁহার মুখে প্রস্থানের কথা শুনিয়া আমি সবিশেষ বিচলিত হইলাম।

তার পরদিন তাঁহার বিদায়ের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া, সহজ ভাবেই রাত্রি-যাপনের জন্য যথাসময়ে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলাম। শয্যাও গ্রহণ করিলাম। নিদ্রা হইল না, নয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিল। অন্ধকার-গৃহ, নতুবা পত্নীর নিকট ধরা পড়িতাম। মধ্য-রাত্রে শ্রীশচন্দ্রের গলা শুনিলাম। পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রি-কালেও কি তোমার অবসর নাই?" আমি তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দের বিদায়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "মানুষটির শেষ বিদায়ের দিনে তোমার এইরূপ নিশ্চিন্ততা—সকল কাজেই শেষ রক্ষা করিতে পার না!"

আমি ঘরের বাহির হইলাম। জ্যোৎস্নায় সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত। শ্রীশচন্দ্রের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি দুই বাহু দিয়া আমায় বুকে ধরিলেন। সেই স্পর্শ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তার পর বাঁধন খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "তোমার হবে। যোগ তুমি পাবে। আমার কথা মনে রাখিও।"

মর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া ভাষা বাহির হইল "আপনার সহিত আবার কি দেখা হবে?"

তিনি সস্নেহে উত্তর দিলেন "হবে—হবে। অনেক কাজ তোমার সঙ্গে আমার করার আছে।"

তার পর তিনি নৌকায় গিয়া উঠিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, যতদূর দৃষ্টি চলে—নৌকাখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তার পর ঘরে ফিরিলাম ভগ্ন হৃদয়ে। কি হইল, তাহা অবর্ণনীয়।

অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাস শেষ হয়। সংবাদ

না পাইয়া শ্রীশচন্দ্র আসিয়া জানাইল "ব্যাপার কিছু বুঝা যাইতেছে না। সুদর্শনকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া দিব মনে করিতেছি।" তাহাই হইল। সুদর্শন পণ্ডিচারী গেল, যথাসময়ে সে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে তাহার হাতে—একখানি আঁটা খাম। খামের উপর আমার নাম লেখা। খামখানা খুলিলাম, সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনটি মন্ত্র তাঁহারই হস্তাক্ষরে লেখা—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের। মনে পড়িল—তাঁহার অজ্ঞাতবাসকালে পার্শ্বের কক্ষে পল্লীবালকদের লইয়া হাজার বার চীৎকার করিতাম—"জ্ঞান, শক্তি, প্রেম দে মা!" এ সেই জ্ঞানের মন্ত্র, শক্তির মন্ত্র ও প্রেমের মন্ত্র। তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন—"প্রত্যেক মন্ত্রটি ১০০৮ বার জপ করিতে হইবে।" শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই সময়ে ধ্যান করিতেন, মন্ত্র জপ করিতেন—স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমারও গুরুমন্ত্র ছিল, সাধনাও ছিল। শ্রীঅরবিন্দের এই মন্ত্রদানে আমার অন্তরে দ্বন্দ্ব বাধিল। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রই সাধিলাম। সেই মন্ত্রের পাশে একটি ঠিকানা লেখা ছিল, ইহা পণ্ডিচারীর কোন ভদ্র-লোকের ঠিকানা। সুদর্শন বলিয়াছিল "অতঃপর এই ঠিকানায় তিনি পত্র দিতে বলিয়াছেন। রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম সকল বিষয়ক নির্দ্দেশই আপনার নিকট আসিবে, আপনি শ্রীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।" সেদিন ছিল ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি—আমি পূর্ব্বদীক্ষিত হইলেও, শ্রীঅরবিন্দের নবদীক্ষা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলাম—এই পুণ্যদিনেই।

*

* *

॥ চার ॥

শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার ব্যক্তিগত অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। আমি এই দিক্ দিয়া অতিশয় সতর্কতার সহিত শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কথা বলিতে চাহি, তাহা হয়ত অন্যের অবিদিত। এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার মানুষ একজন আছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পত্রাদি হইতেই তাঁহার সহিত আমার অধ্যাত্মসম্বন্ধ ও তাঁহার রাষ্ট্রীয় মতামত প্রমাণিত হইবে। ইহা আজ বাঙালী জাতির জানিবার বিষয় বলিয়া আমার এই বিষয়ে লেখনীধারণের আগ্রহ।

শ্রীঅরবিন্দ বিদায় লইলেন। চন্দননগরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রহিল। সুদর্শনের কথামত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পত্র দিলাম। পত্রোত্তরে তিনি জানাইলেন—তাঁর পণ্ডিচেরীতে আগমন সংবাদে তাৎকালীন রাজকীয় সংশয়ভাজন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ভি. ভি. এস্. আয়ার ও তামিল-কবি ভারতীর উদ্যোগে বিপুল জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে আসায়, ঘটনাটি সর্ব্বজন বিদিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই তিনি যে বাস-বাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে সর্ব্বদাই ইংরেজ পুলিসের ঘাঁটি বসান হইয়াছিল। তিনি এই পত্রে আরও জানাইয়াছিলেন—শ্রীনিবাসের ভ্রাতা পার্থসারথি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকার করারও নির্দ্দেশ পত্রে ছিল। পার্থসারথি

ছদ্মনামই তিনি পত্রযোগে জানাইয়াছিলেন। রাষ্ট্রগুরুরূপে—তিনি এই বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার বিশিষ্ট পুলিস কর্ম্মচারী মিঃ ডেনহ্যাম-ভ্রমে মিঃ কাউলির গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি ধৃত হন, তাঁহার সঙ্গিরূপে ধৃত অন্য দুই ব্যক্তি উভয়েই চন্দননগরের নিকট-প্রতিবেশী। আমার সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হেতু এই সময় হইতেই পুলিসের অনুচরবৃন্দ ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিত। কাজে-কাজেই তাহাদের ফাঁকি দিতে অনেক সময়ে আমায় কলিকাতার পথে গা-ঢাকা দিয়া চলিতে হইত। আমি এই ভাবেই পার্থসারথির সহিত সাক্ষাৎকার করি। তিনি অনেক কথার পর স্বামী বিবেকানন্দের কোন একখানি পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পাতার অংশবিশেষ হইতে একটি কোড্ অর্থাৎ আক্ষরিক গুপ্তলিপি রচনা করিয়া আমার গোচর করেন এবং বলেন—"এই কোর্ডে শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিবেন। আপনিও তাঁহাকে এই কোডেই পত্র দিবেন। যদি পুলিস আমাদের পত্র হস্তগতও করে, তাহারা কিছুই বুঝিবে না।" এইরূপ নিরাপদ্ পত্রব্যবহার শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার অনেকদিন চলিয়াছিল।

চন্দননগর ফরাসী রাজ্য হওয়ায়, ফরাসী পোষ্ট-অফিসের ভিতর দিয়া আমি পত্রাদি প্রেরণ করিতাম। পত্র শ্রীঅরবিন্দের নামে যাইত না। এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের নাম দিয়া পত্রগুলি প্রেরিত হইত। তিনি রাষ্ট্রীয় বিপ্লব-সম্পর্কিত গুপ্তনির্দ্দেশ সব এই সঙ্কেতলিপিযোগেই আমায় পত্রে দিতেন। সেই গুপ্তাক্ষরে লিখিত পত্রাবলী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস্ টেগার্ট আমার বাড়ী

খানাতল্লাসী করার সময়ে পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। নতুবা শ্রীঅরবিন্দের তদানীন্তন রাষ্ট্রনির্দ্দেশ কিরূপ ছিল, তাহা প্রমাণসহ আজ উপস্থাপিত করিতে পারিতাম। চন্দননগরের বিপ্লবমণ্ডলী শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হয় নাই। সে যুগে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে থাকিয়া চন্দননগরের মধ্য দিয়া যে রাষ্ট্রীয় নির্দ্দেশ দিতেন, তাহাই বাংলার বিপ্লবী দল পালন করিত। পরে তিনি ইহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত তাঁহারই নির্দ্দেশে বাংলার বিপ্লবিগণ পরিচালিত হইত। তাঁর এই বৈপ্লবিক নির্দ্দেশের মূলেও ছিল রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার অনুপ্রেরণা। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে প্রস্থানকালে শ্রীশচন্দ্র ঘোষের নিকট এক ব্যক্তির নাম দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত সংযোগসূত্র স্থাপন করি। তিনি পরলোকগত সুরেশচন্দ্র দত্ত। মাণিকতলা-সম্পর্কিত বোমানির্ম্মাণের গুরুরূপে হেমচন্দ্র দাসের (কানুনগো) নামই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মাণিকতলার বোমার মামলার পর একমাত্র এই সুরেশচন্দ্র দত্তই বাংলায় বোমানির্ম্মাণের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি এম. এস্-সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তারপরে তিনি রিপণ কলেজের অধ্যাপক হন। তাঁহারই সাহায্যে চন্দননগরে এম্. এস্-সি ক্লাসের ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক বোমা-প্রস্তুতির কৌশল শিক্ষা করেন, এবং ইঁহারই তত্ত্বাবধানে চন্দননগরে বোমাপ্রস্তুতির গুপ্ত কারখানা স্থাপিত হয়।

সুরেশচন্দ্র দত্তের নাম শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম, পরে বোমা-নির্ম্মাণের ব্যাপার লইয়াই তাঁহার সহিত চন্দননগরের সংযোগ স্থাপিত হয়। সুরেশচন্দ্রের শিক্ষা-কৌশলে ও

মণীন্দ্রনাথের প্রতিভায় চন্দননগরের বোমা শক্তি ও বৈশিষ্ট্যে ভারতের বিপ্লবকেন্দ্রে ঐতিহাসিক বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীতে বসিয়া বাংলার বিপ্লবীদের যথারীতি নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষে আমি দুইজন স্থানীয় ফরাসী রাষ্ট্রপ্রতিনিধির সহিত পণ্ডিচারীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের আগমনে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের জন্য শহরে ইংরেজ পুলিসের বিশেষ উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। বিশেষতঃ, বাঙালী দেখিলেই এই সকল গুপ্ত পুলিস তাহাদের চক্ষে-চক্ষে রাখিত। আমি ফরাসী রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত রু-দে-গ্রাঁ বাজারের সন্নিকটে রাঙ্গাপুলের প্রসিদ্ধ ভবনে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদিন অপরাহ্ণে নিকটবর্ত্তী পণ্ডিচারীর প্রসিদ্ধ ওদঞ্জল মাঠে যে ফুটবল খেলা হইত, তাহা দেখিতে বাহির হই। এই সময়ে শ্রীনলিনীকান্ত ও সুরেশচন্দ্র ওরফে মণি ফুটবল খেলায় যোগ দিতে আসিতেন। শ্রীঅরবিন্দের শ্যালক সৌরীন্দ্রনাথ বসুও এই মাঠে পদচারণা করিতেন। এইখানেই সুকৌশলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। আমার পণ্ডিচারীতে আগমনের কথা পূর্ব্বেই পত্রযোগে শ্রীঅরবিন্দকে জানাইয়াছিলাম। সৌরীন্দ্র আমাকে দেখিয়াই সঙ্কেতে আমায় মাঠ হইতে দূরে যাইতে আহ্বান করিলেন। কোম্পানী বাগানের এক পথে দুইজনে মিলিত হইলাম। আমরা এক খোলার বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। যোসেফ্ ডেভিড্ নামে এক মাদ্রাজী ছাত্রের সহিত আমার এই বাড়ীতে পরিচয় হইল। ইনি পরে পণ্ডিচারীর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার

ও মেয়র হইয়াছিলেন। তাঁহারই সহিত আমার পরিচয় করাইয়া সৌরীন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় আমি যোসেফ ডেভিডের সহিত সাক্ষাৎকার করিলাম। তিনি একখানি পুশ্‌পুশ্‌ ভাড়া করিয়া আমায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট লইয়া চলিলেন। তিনি আমাকে একজন রমণীর মত সর্ব্বাঙ্গে মাদ্রাজী চাদরে মুড়িয়া পুশ্‌পুশে চড়াইয়াছিলেন। যোসেফ ডেভিড একজন নারীকে লইয়া শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন, এই হেতু পুলিস প্রহরীদের এ বিষয়ে কোনই মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। আমি দেখিলাম—বাড়ীর অপর ধারে একদল গোয়েন্দা পুলিস জটলা করিতেছে; আমার একপ্রকার নারীবেশ হওয়ায়, তাহারা কিছুই মনে করিল না। আমরা দুইজনে এই বিশাল ভবনে প্রবেশ করিলাম। নিম্ন-তলেই নলিনীকান্তের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহার অপার্থিব সৌহার্দ্দ্য সেদিনও অনুভব করিয়াছি। তিনি বলিলেন—"মণি অর্থাৎ সুরেশচন্দ্র আজ আমাদের সৈরিন্ধ্রী।"

আহার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে শুনিলাম—"খেচরান্ন হইতেছে।" অন্ধকারের মধ্যে একটি কেরোসিন তেলের ডিবায় মিটি-মিটি আলো জলিতেছে। সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "রন্ধনের বালাই বিশেষ কিছু নাই, আমরা রাত্রে খেচরান্নেই উদর পূর্ত্তি করি।" ইঁহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিতে-ভাবিতে আমি দ্বিতলে উঠিয়া হলঘরের সম্মুখেই শ্রীঅরবিন্দকে দেখিলাম। বহুদিন পরে আবার তাঁহার দর্শন, তাঁহার হৃদয়েরও স্পর্শ পাইলাম।

তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ? সাধন কেমন

চলিতেছে ?” ইতিপূর্ব্বে তিনি যৌগিক সাধনের কয়েক খণ্ড টাইপ-করা কাগজ চন্দননগরে আমায় পাঠাইয়াছিলেন। তাহার প্রথমেই লেখা ছিল—“There is no need of asana, pranayama etc.”—কথাগুলি আমার পক্ষে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। আমার সাধন ছিল চেষ্টাপ্রসূত। তাহা হইতে বিরত থাকার আদেশ এই কয়েক খণ্ড কাগজে তিনি দিয়াছিলেন। আবও তাঁহার কথা ছিল “মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি”—এই মন্ত্র অবশ্য আমাকে অনেক কর্ম্মে ভরসা দিত। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি”। তাঁহার এই কথায় আমার মৃত্যুভয়ও দূর হইয়াছিল। কোন কর্ম্মই প্রচেষ্টায় সাধিত না হয়, তাহার জন্য নিজেকে সর্ব্বদাই স্থির রাখিতাম। সাধনার কথা বলিতে-বলিতে দুইজনে হলঘরের একপার্শ্বে কয়েকখানি ভাঙ্গা চেয়ার ও একখানি পুরাতন টেবিলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি টেবিলের একপাশে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমাকেও তিনি বসিতে বলিলেন। দেখিলাম—টেবিলের উপর কয়েকটা মটর-ভাজা পড়িয়া আছে। অপরাহ্ণে ইহাই চর্ব্বণ করিয়া তিনি চা পান সমাপ্ত করেন। তাঁহার দিকে আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া মনে হইল—যেন তিনি অনেক শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছেন। চন্দননগরে তাঁহার যে শ্রী দেখিয়াছিলাম, এখানে যেন সে কান্তি বহু পরিমাণে ম্লান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষের দীপ্তি মনে হইল আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি আমার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া যেন প্রসারিত দৃষ্টিতে আমার সাধনার অবস্থা জানিয়া লইলেন; তারপর বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম্মের সকল বিষয়ও তিনি অবগত হইলেন। বিদায়কালে তিনি বলিলেন “প্রতিদিন এখানে আসা তোমার পক্ষে

সঙ্গত নহে। তোমাকে বাংলায় ফিরিয়া অনেক কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। সপ্তাহে দুইদিন মাত্র আমার সহিত দেখা করিও। আজ মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবারে আবার আসিও, অনেক কথা হইবে।”

আমি তাঁহার তাৎকালীন অবস্থার কথা ভাবিতে-ভাবিতে নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার সঙ্গে-সঙ্গে উপরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আমি নীচে নামিবামাত্র বন্ধুদের হাস্যরবে সব যেন মুখরিত হইল। সুরেশের খেচরান্ন-রন্ধন শেষ হইয়াছে। সে হাঁড়ির কাণা ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সৌরীন্দ্র বলিলেন “নারীর বেশে আপনি যে পরিমাণে নিরাপদে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই অবস্থায় যদি পুলিসের দৃষ্টিগোচর হন, তবে তাহারা আপনার অনুসরণ করিবে এবং আপনাকে পণ্ডিচারীতে থাকিয়া যাইতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আপনাকে গোপন পথেই প্রস্থান করিতে বলিয়াছেন।” নলিনী ও সৌরীন্দ্র আমাকে গোপন পথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা একটি গলি-পথ। এই দিক্‌টা অন্য লোকের বাড়ীর প্রাচীরে রুদ্ধ হইয়াছে। সেই গৃহের আবর্জ্জনারাশি এইখানেই নিক্ষিপ্ত হয়। সেই পথ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, সোজা রাস্তায় উঠা যায়। সৌরীনের কথামত আমি এই গোপন পথ দিয়া বাহির হইলাম এবং নিরাপদে রাঙ্গাপুলের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিবার সময়ে সৌরীন্দ্র বলিয়াছিলেন—মধ্যাহ্নে ওদঞ্জলের নিকট কোম্পানীর বাগানে সাক্ষাৎকার করিবার জন্য। আমি যথা-সময়ে বাহির হইলাম। কোম্পানীর বাগানে গিয়া সৌরীন্দ্রের

তাঁহাদের দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে অবগত হইলাম। রীন্দ্র বলিলেন "মাদ্রাজের ধনী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কোন এক লোকের সাহায্যে এক বৎসরের জন্য এই কয়েকটী প্রাণ রক্ষা য়াছে, তাহার পর যথেষ্ট তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সাহায্য র তেমনভাবে মিলে নাই। যৎসামান্য যাহা কিছু তিনি াইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমরা একবেলা কোন প্রকারে চয়া থাকিতে পারি। এই বিষয়ে আপনি কি করিতে পারেন, মাদের জানাইয়া যাইবেন।"

আমি সেই মূহূর্ত্ত হইতেই শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গিগণের নোপায়-নির্দ্ধারণের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। সৌরীন্দ্রকে লাম "চন্দননগরে গিয়াই আমি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিব। বিষয়ে আমরা এতদিন নীরব ছিলাম—ইহাই আমাদের ার বিষয়। বাংলার কর্ণধার শ্রীঅরবিন্দ বিদেশে আসিয়া ভাবে আছেন, ইহার খবর আমরা রাখি নাই। ইহাই আমাদের াগ্য।" এদিকে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সেই গোপন পথে মি শ্রীঅরবিন্দের সহিত দেখা করিতে যাইতাম। বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার কথা দুই-চারি দিনেই শেষ হইল। তারপর অধ্যাত্ম- ধনার কথাই সপ্তাহে দুই দিন তাঁহার মুখে অনর্গল বাহির ল। আমি কাণ পাতিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া হৃদয়ে ণ করিলাম। হঠযোগ, রাজযোগ, তন্ত্র, সহজিয়া—সকল সাধনার রে তাঁহার মুখে গীতার "আত্মসমর্পণযোগ" মহা-মন্ত্রে আমার ত্ত আলোকিত হইল। "You need not do Asana and ranayama"—তাঁহার কথায় আসন, প্রাণায়াম বন্ধ হইয়াছে। র দেওয়া ত্রিমন্ত্র-জপের সহিত "ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদি স্থিতেন

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি”—এই শ্লোকটিও আমার জ
বিষয়ীভূত হইয়াছিল। “হৃষীকেশ” বলিতে তখন নিত্য শ্রীঅর
ব্যতীত আমি আর কাহাকেও মনে করিতে পারিতাম
খাইতাম, শুইতাম তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া—অতি সঙ্কটময় ব
আগুয়ান হইতাম এই প্রত্যক্ষ হৃষীকেশেরই আদেশে।
হইলে, এই হৃষীকেশকেই অনুস্মরণ করিতাম। বিদায়ক
আমার অবস্থা তিনি মর্ম্ম দিয়াই অনুভব করিলেন। তারপর
তাড়া কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন “তো
সাধনার নির্দ্দেশ ইহা হইতে আরও বিশদরূপে পাইবে। পূ
যে সাধনার কথা টাইপ করিয়া তোমায় পাঠাইয়াছিলাম, ত
ঠিক আমার নিজের নহে। আমি ধ্যানযোগে রাজা রামমোহন রা
বাণী যেমনভাবে পাইয়াছিলাম, তদনুরূপ উহা লিপিবদ্ধ হইয়া
তাহার পর এই লেখাগুলি আমার নিজেরই উপলব্ধির কথ
তুমি ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে।”

আমি বাসায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার টাইপ-করা কা
গুলির মাথায় “Yoga and its object”—এই শিরোনামা লি
এই গ্রন্থেরই বাংলা অনুবাদ “লীলা” নামে গ্রন্থাকারে আমি প্র
করিয়াছি। তাঁহার প্রথম পুস্তকখানিও “যৌগিক সাধন”
বাংলায় অনূদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমি অনেক রাষ্ট্রনীতিক নির্দ্দেশ এবং সাধন-রহস্যের
বুকে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। কিছুদিন পরেই তিনি পত্রে
জানাইলেন—“Situation just now is that we have Re
so in hand.” অর্থাৎ “অবস্থা এক্ষণে এমন হইয়াছে যে, আম
হাতে মাত্র আট আনা পয়সা আছে।”

আমি আসিবার সময়ে কয়েকটি টাকা সৌরীন্দ্রের হাতে দিয়া াসিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ সেই টাকায় কয়েকদিন চলার পর ীঅরবিন্দ এমনই ভাবে অভাব-রাক্ষসীর তাড়নায় ঘোরতর বিপন্ন ইয়াছেন। তাঁহার পত্র পাইয়া আমার চক্ষে জল আসিল। সেই ময়ে আমার হাতে কিছু টাকা চেয়ারের কারবারের হিসাবে ছল। তাহা হইতে পঞ্চাশ টাকা লইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দলাম।

কিছুদিন পরে তাঁহার আর এক পত্র পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত ইয়া পড়িলাম। তিনি পুনরায় জানাইলেন ঃ

"I must ask you to procure for me by Will-Power or any other Power in heaven or on earth." অর্থাৎ "আমি তোমার কাছে চাহিতেছি—যেমন করিয়া পার, আমার জন্য অর্থ সংস্থান কর। তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই হউক অথবা স্বর্গের বামর্ত্ত্যের যে কোন শক্তির সাহায্যে পার, অর্থ আমার জন্য প্রেরণ কর।"

আমি গভীর ভাবনামগ্ন হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎকার নিষ্ফল হয় নাই। আমি যে তাঁহার কত আপনার, ইহা জানিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ দাবী তিনি আমার উপর করিতে পারিয়াছিলেন। সাধনার ইতিহাসে এই তত্ত্বের মূল্য শুধু আমার কাছে অনেকখানি নহে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে এই দাবীর তাৎপর্য্য কতখানি শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া আমি কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে বিহ্বল হই।

অতঃপর চন্দননগর হইতে যথারীতি তাঁহার জীবন-যাপনের সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্য নিজেকে আমি ধন্য

মনে করি। শ্রীঅরবিন্দেব পবিচয় তাঁহার পত্রাদিব মাবফৎই কিছু কিছু শুনাইবার প্রযাস পাইব। ইহা ভাবতাত্মার বাণী। ভারত সংস্কৃতির অসাধারণ ঐতিহ্যেব এই অধ্যাযটুকু না জানিলে যেমন শ্রীঅরবিন্দের পুণ্যময় মহাজীবনের একটি অংশ অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে, তেমনি ভারতের জাতীয় সাধনায় তাঁর সুগভীর অবদানেব অনেকখানি মর্ম্ম-পরিচয় অপ্রকাশিত থাকিবে।

*

* *

॥ পাঁচ ॥

১৯১২ এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের সুদক্ষ কিন্তু গোপন পরিচালনায় বাংলার বিপ্লববাদ পূরা দমে চলিয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ পত্রই "কোডে" অর্থাৎ সাঙ্কেতিক অক্ষরে আসিত। আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতাম। তিনি অর্থ সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিপন্ন মনে করিলেও, আমাকে পত্রযোগে তাহা জানাইতেন।

আমি তাঁহার অর্থাভাবের কথা পণ্ডিচারী হইতেই জানিয়া আসিয়াছিলাম। শুধু অর্থাভাব নহে, বস্ত্রাভাবের অত্যন্ত দুঃখও স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আমি অতি দ্রুত তাঁহাকে কিছু টাকা এবং বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিলাম। তিনি লিখিলেন:

"Your money (by letter and wire) and clothes reached safely."

"পত্র ও তারযোগে তোমার টাকা এবং বস্ত্রাদি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়াছি।"

এই সময়ে তাঁহার যে দারুণ অর্থকষ্ট, দূরে থাকিয়া তাহা পূর্ব্বে সম্যক্ বুঝি নাই। তিনি এক প্রকার নিঃস্ব অবস্থায় পণ্ডিচারী পৌঁছিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি চিরদিন ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া চলিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। সঞ্চয়প্রবৃত্তি তাঁহার কোনদিন ছিল না। গীতায় মন্ত্রভাব—ভগবানের উপরেই 'যোগক্ষেম'-বহনের ভার দিয়া চলার সাধন-নীতিটা যেন তাঁর তখনকার জীবনে অক্ষরে-অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমার নিকট তাঁহার যেটুকু অর্থ চাওয়া,

তাহার মধ্যেও ঈশ্বর-প্রসাদই ছিল, নতুবা তাঁহার সেই দাবীটুকু পূরণ করার প্রাণ লইয়াই আমার জীবনে নূতন সৃষ্টির দ্যোতনা এমন অভাবনীয় রূপে দেখা দিত না।

পণ্ডিচারী গিয়াই তিনি কোন এক বন্ধুর কিছু সহায়তা পাইয়াছিলেন, সে-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি তাঁহাকে কতখানি দিতে পারিব, সে বিষয়ে সবিশেষ ধারণা করার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের চিন্তা বাধ্য হইয়াই করিতে হইত, কিন্তু কোথা হইতে অর্থ তাঁহার নিকট আসিবে তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তবে তাঁহার কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থ একদিন আসিবেই—এই বিষয়ে কোনরূপ সংশয় তিনি পোষণ করিতেন না। এক মাদ্রাজী বন্ধু ১০০০৲ টাকা তাঁহাকে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং যাহাতে পণ্ডিচারী বাসকালে অর্থাভাবে তাঁহাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে না হয়, তাহারও চেষ্টা করিবেন, আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বন্ধুটির প্রতিশ্রুতি ও আশা কোনটিই সফল হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে পত্রযোগে আমায় জানাইয়াছিলেন:

"The last time he came, he brought a promise of Rs. 1000/ in a month and some permanent provision afterwards, but the promise like certain predecessors has not yet been fulfilled and we sent him for cash. But though he should have been here three days ago, he has not returned and even when he returns, I am not quite sure about the cash and still less sure about the sufficiency of the amount."

শ্রীঅরবিন্দ শিশুকাল হইতেই ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন, সে-কথা

রি বলিয়াছি। এই পত্রেও তিনি আমায় লিখিয়া জানাইলেন
ৌতুকে তাঁহার নিজের মনেরই কথা :

"No doubt, God will provide, but He has contracted
ɔad habit of waiting till the last moment."

"ভগবান্ যে ব্যবস্থা করিবেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই ; কিন্তু
র এই দুষ্ট স্বভাবটুকু দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তিনি শেষ মুহূর্ত্তটি
্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ছাড়েন না।"

আমি তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া অবধি অতিশয় চঞ্চল হইয়া
ড়লাম। কোন্ প্রকারে তাঁহাকে কিরূপে অধিক অর্থ পাঠাইতে
রা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার যৎকিঞ্চিৎ
কা ও কিছু বস্ত্রাদি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। শুনিয়া
াসিয়াছিলাম—তাঁহাদের পাঁচজনের জন্য প্রতি মাসে অন্ততঃ
১৲ টাকা খরচ হয়, আর শ্রীঅরবিন্দের নিজের ব্যক্তিগত খরচের
ন্য অন্ততঃ ১০৲ টাকা হাতে থাকা উচিত। আমি এই ৮৫৲ টাকা
তি মাসে পাঠাইবার জন্য অনুপ্রাণিত হইলাম। আমার আশা
র্ণ হইল এবং প্রথম দফা টাকা যথারীতি প্রেরিত হইলে, তিনি
িখিলেন :

"It is a great relief to us that you are able to send
ls 80/—this time and Rs. 85/- for March."

অর্থাৎ "তুমি এবারকার ৮০৲ টাকা এবং মার্চ্চ মাসের জন্য ৮৫৲
াকা পাঠাইতে পারিয়াছ দেখিয়া আমরা খুবই আশ্বস্ত হইলাম।"

শ্রীঅরবিন্দের এই আকূতি আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে
রিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সেবার অবদান যোগাইবার প্রেরণা
াগাইয়াই তিনি ধীরে-ধীরে প্রকাশ করিলেন—আমার মধ্য দিয়া

কত অর্থসংগ্রহ ও অর্থাগমের উপায়-সৃষ্টিব প্রয়াস—তাহা ভাবি স্তম্ভিত হই। সে যুগে তাঁহার অর্থসংগ্রহের সকল প্রচেষ্টাই আমা কেন্দ্র করিয়া সাফল্যলাভ কবিযাছিল। বাংলার রাষ্ট্র-সাধনা যেটুকু সাফল্যলাভ করিযাছি, তাহাও শ্রীঅরবিন্দের করুণায় সম্ভ পব হইয়াছিল। আমি তাঁর কত আপনাব জন মনে করিয়া তি আমাব উপর একরূপ ক্ষুদ্র দাবীই রাখিতেন, সে কথা ত্র বলিতেছি। তিনি চাহিতেন প্রচুব অর্থ। আমি তাঁহার কত দাবীই বা পুবণ কবিয়াছি—তাঁহার চাওয়ার মূল্য সেদিন তে করিযা বুঝি নাই। সেদিন কিন্তু বুঝি আমায় সান্ত্বনা দিবাব ছ তাঁহার দাবী পূরণ করার ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকুই তাঁহার নিকট যেন যথে বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি আমাব নিকট মাসিক ৮৫৲ টা পাইবেন, এই সামর্থ্যসৃষ্টির পর, তিনি আমায় তাঁর এক পত্র লই বস্ত্রব্যবসায়ী ম্যাড্‌গড্‌কাবের নিকট উপস্থিত হওয়াব জ লিখিলেন:

"I send enclosed a letter to our 'M' (Marathi) frien If he can give you anything for me, please send without the least delay."

—'এম" অর্থাৎ মারাঠী বন্ধুকে একখানি পত্র দিলাম—আমার জ যদি তিনি কিছু দেন, অবিলম্বে তাহা আমার নিকট পাঠাইও।'

ম্যাড্‌গড্‌কার একজন অবাঙালী ভদ্রলোক। কলিকাতা বড়বাজারে তাঁহার কাপড়ের গুদাম ছিল। তিনি বাস করিতে বালিগঞ্জে। আমি খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম তিনি প্রথমে আমায় পুলিসের চর বলিয়া বিদায় দিলেন শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানি কিন্তু সঙ্গে রাখিলেন। তাহার পরদিন আ

আবার তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। এবার বুঝিলাম—তিনি সংবাদ লইয়া আমার কথা বিশেষভাবেই অবগত হইয়াছেন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন চন্দননগরে কিভাবে ছিলেন এবং কিরূপেই বা পণ্ডিচারী গমন করিলেন, বিশেষ-ভাবেই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু টাকা তিনি আমার হাতে দিলেন না, সহাস্যে বলিলেন—"আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিয়া টাকা দিতেছি না, ইহা আপনি মনে করিবেন না। শ্রীঅরবিন্দের নামে অনেক টাকাই মধ্যবর্ত্তী লোকের হাতে পড়িয়া শেষ হইয়াছে—ইহা বুঝিয়াই আমরা স্থির করিয়াছি, সোজাসুজি ভাবেই তাঁহার হাতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিব, অন্য প্রকারে নহে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। তাঁহাকে লিখিয়া জানাইতে পারেন—আমি ১০০০৲ টাকা তাঁহাকে গ্রীণ্ডলে কোম্পানীর মারফৎ প্রেরণ করিব। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া চন্দননগরে ফিরিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলাম। তিনি যথাসময়ে গ্রীণ্ডলে কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা পাইয়াছেন জানাইলেন। ম্যাড্গড্কারের টাকা পাইয়া তিনি এইবার পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ৪১ নং রু-দে-ফ্রাঁসোয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বাড়ীওয়ালার ১২০৲ টাকা ভাড়া বাকী ছিল। এই সময়ে বাড়ীওয়ালার বিরুদ্ধে কোন এক পাওনাদার নালিশ রুজু করায় এই টাকা শ্রীঅরবিন্দ নিজের হাতেই রাখিয়াছিলেন, এই কথাও তাঁহার পত্রে জানিয়াছিলাম।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি চন্দননগর ফিরিয়াই শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় বিপ্লবের কাজে প্রবলভাবে লাগিয়া যাই। শ্রীঅরবিন্দকেও এই কাজে কতকটা জড়াইয়া ফেলি। তখন অনন্যোপায় হইয়াই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সেই সময়ে পণ্ডিচারী "ফ্রী-পোর্ট" বলিয়া বিদেশ হইতে বহু দ্রব্য আমদানী হইত। আমার বিপ্লবী সহযোগিগণ স্থির করিলেন—পণ্ডিচারী হইতে রিভলভার আনা হইবে। ইহার ব্যবস্থার ভার বন্ধুরা আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমায় বাধ্য হইয়াই এই বিষয়টি শ্রীঅরবিন্দকে জানাইতে হইল। তাঁহাকে ছয়টি রিভলভার ক্রয় করিবার জন্য নিবেদন করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমার দাবী অপূর্ণ রাখিলেন না। কিন্তু স্বাভাবিক সতর্কতার বশে রিভলভারগুলি হস্তগত হইলে, তাহা তিনি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। এইগুলি আমাদের নিকট পাঠাইবার সুযোগ বহুদিন মিলিল না। পণ্ডিচারীতে অনেক বন্ধু তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট তিনি যে তথায় যোগসাধনের নিমিত্তই আসিয়াছেন, এই কথাই বলিতেন। বাংলার বিপ্লবীদের সহিত তাঁহার যে সংযোগ থাকিতে পারে, এই কথা তিনি একেবারেই গোপন রাখিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে দিয়া ঐ রিভলভারগুলি অতি সন্তর্পণে ও সুকৌশলে লইয়া আসা হয়। কিন্তু মাটিতে এক বৎসর কাল প্রোথিত থাকায় যন্ত্রগুলি এক প্রকার অকেজো হইয়াই গিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ কত সতর্কতার সহিত বাংলার বিপ্লব-সংহতির সহিত যোগ রাখিয়া চলিতেন, তাঁহার পত্রই এই কথার সাক্ষ্য দিবে :

"I do not write to you this time about the despatch of the books, because that is a long matter and would delay the proofs which have already been too long delayed. But I shall write a separate letter on that subject. I have also to write about your Tantric Yoga, but I think I

shall await what else you have to tell me on that subject before doing so."

Kali.

P. S Dont delay long in sending the money."

ইহার অর্থ অন্য কেহ বুঝিবেন না। আমি বুঝিলাম—তিনি গ্রন্থ' অর্থাৎ রিভলভারগুলি পাঠাইতে ইতস্তত: করিতেছেন এবং আমাকেও তিনি তান্ত্রিক যোগ অর্থাৎ বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন শুধু সাঙ্কেতিক ভাষায় নয়, বিপ্লবের রাষ্ট্রসাধনাকে যথার্থই বীরাচারী শক্তিসাধনা বলিয়াই গণ্য করিতেন, আর তাহার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির নয়, জাতির সমষ্টিগত মুক্তি ও ভুক্তি! তাঁহার সম্মুখে সেদিন কত বড় মহা-কর্ম্ম প্রতীক্ষারত, তাহা অনেকেরই মত আমিও সম্পূর্ণ বুঝি নাই এবং সেই বৃহৎ প্রেরণা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার চিন্তা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না। অবশ্য তিনি যেরূপ আদেশ করিতেন, তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই আমার স্বভাব ছিল। আমার বিপ্লবী বন্ধুগণ কিন্তু আমায় পণ্ডিচারী হইতে রিভলভারগুলি আনাইবার জন্য ঘন-ঘন তাগিদ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দেশনেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর. এস. শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠান। আমি সেদিন বুঝি নাই—এই শর্ম্মা পুলিসবিভাগেরই একজন গুপ্তচর। শ্রীঅরবিন্দের

---

* শ্রীঅরবিন্দের অনেকগুলি পত্রে 'A.G'-র পরিবর্ত্তে 'Kali'—এইরূপ স্বাক্ষর আছে। আলিপুর জেলে তাঁহার "বাসুদেব দর্শন" হইয়াছিল। চন্দননগর অজ্ঞাতবাস-কক্ষে তাঁহার "দিব্যমাতৃকা" বা "কালী"-দর্শনের অনুভূতিই এইরূপ স্বাক্ষরের কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়।—প্রকাশক

সহিত সংযোগস্থাপনের জন্য এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পাঠান হয়। এই শর্ম্মা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ পত্র-পত্রে আমায় জানাইলেন :

"Your R. S. Sharma I hold to be a police spy. I have refused to see him, because originally when he tried to force his way into my house and win my confidence by his extravagances, I received a warning against him from within, which has always been repeated. This was confirmed afterwards by two facts, first, that the Madia police betrayed a very benevolent interest in the success of his mission ; secondly, that he came to Pondicherry afterwards as sub-editor of a new Pondicherry paper, 'the Independent', subsequently defunct and replaced by another, the Argos belonging to the same proprietor who has been openly acting in concert with the British Police against us in Pondicherry. In this paper he wrote a very enervating and depreciatory paragraph about me, (not by name but by allusion) in which he vented his spite at his failure................ ."

অর্থাৎ "তোমার প্রেরিত আর. এস. শর্ম্মাকে আমি একজন পুলিসের গুপ্তচর বলিয়াই মনে করি। আমি তাহার সহিত দেখা করি নাই ; কারণ প্রথম যখন সে আমার বাড়ীতে জোর করিয়া ঢুকিতে চায় ও অতিশয়োক্তি দ্বারা আমার বিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করে, তখন তাহার বিরুদ্ধে আমি অন্তর হইতেই সতর্ক হইবার সঙ্কেত পাই। এই রকম সঙ্কেত আমি বারবারই পাইয়াছি। এই সঙ্কেতেরই সমর্থন মিলে পরবর্ত্তী দুইটি ঘটনায়। প্রথমতঃ,

মাদ্রাজী পুলিস যে শর্ম্মার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাপারে বেশ উৎসাহশীল, তাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার পরে সে যখন আবার পণ্ডিচারীতে আসে, তখন অধুনা-বিলুপ্ত "দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামে একটি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। পরে এই পত্রিকার স্থলাভিষিক্ত হয় 'আর্গস' পত্রিকা, উহাও একই স্বত্বাধিকারীর কাগজ, যিনি পণ্ডিচারীর বৃটিশ পুলিস-প্রতিভূগণের সহিত প্রকাশ্যে সংযুক্ত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পত্রিকায় ঐ ব্যক্তি আমার নাম উল্লেখ না করিয়াও আমার সম্পর্কে একটি খুব হীনতাজনক নিন্দোক্তি লিখিয়া প্রচার করে, যাহাতে তাহার ব্যর্থতারই জ্বালা প্রকাশিত হয়।.................."

শ্রীঅরবিন্দ এই সকল কথা জানিয়া, ভবিষ্যতে এই প্রকার অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে আমায় নিষেধ করেন। এই সময়ে পণ্ডিচেরীতে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক পলাতক বাস করিতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ পুলিসের অনুযোগে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হন। শ্রীঅরবিন্দকে এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হইল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তদানীন্তন ফরাসী পণ্ডিতসাহেব ও জজসাহেবের সহায়তায় এই প্রয়াস ব্যর্থ করেন। এই বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার এক পত্রে আমায় লেখেন :

"...Other difficulties are disappearing. The case brought against the Swadehsis (No one in this household was included in it, although we had a very charmingly polite visit from the Parquet and Judge d'Instruction) has collapsed into the nether region and the complainant and his son have fled from P. T.

(Pondicherry Territory) and become like ourselves political refugees in C'lore (Cuddalore)"

ভি. ভি. এস. আয়াঙ্গার নামে একজন তরুণ বিপ্লবী পণ্ডিচারীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইংরেজ পুলিস ফরাসী গভর্ণমেন্টের নিকট তাঁহাকে ধৃত করার জন্য অনুবোধ জানায়। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী বলিয়া যাঁহারা পণ্ডিচারীতে ছিলেন, তাঁহাদের সকলের উপর ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তদন্ত সুরু করেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও তাঁহার অতুল প্রতিভায় স্বদেশীরা সে যাত্রায় রক্ষা পান এবং দীর্ঘদিনের জন্য পণ্ডিচারী স্বদেশীদের নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়।

আমি বিপ্লবের কর্ম্মে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকিতাম, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ চাহিত সাধনার নির্দ্দেশ। শ্রীঅরবিন্দকে শুধু আত্মসমর্পণযোগের গুরুস্থানীয় ভাবিয়াই আমি পরিতুষ্ট হই নাই, তাঁহার কার্য্যে আত্মনিবেদন করার জন্য আন্তরিক যত্ন করিতাম, তাঁহার কর্ম্ম শরীর, প্রাণ, মন দিয়া সিদ্ধ করিতে পারিলে আপনাকে তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছি বলিয়া মনে গভীর আশ্বাস ও তৃপ্তি অনুভব করিতাম। আমি পত্রযোগেই তাঁহার সাধন-নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতাম। এক পত্রে তিনি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমার অন্তরে চিরজাগ্রৎ হইয়া আছে। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন তিনি যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না, ভগবৎ-প্রেরণাই তাঁহার জীবনকে পূর্ণ শৃঙ্খলিত করিয়া লইতেছে—পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, তাহা পাঠকপাঠিকা অনুভব করিতে পারিবেন। তিনি লিখিলেন :

"There is no reason for not writing to you. I never now-a-days act on reasons, but only as an automaton

in the hands of another; sometimes He lets me know the reasons of my actions, sometimes He does not, but I have to act or refrain from action all the same, according as He wills.

I shall write nothing about sadhan etc, until I am out of my present struggle to make the spirit prevail over matter and circumstances, in which for the present I have been getting badly the worst of it."

তাঁহার বাস্তব অভাব কতখানি, ইহার ইয়ত্তা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। তিনি মাণিকতলা বাগানবিক্রয়ের টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিব। তাঁহার বস্ত্রাভাবের পরিচয় তাঁহার পত্রাংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

"There is the pressing cry for clothes in this quarter, as these articles seem to be with us to remind us constantly the paucity of matter."

এই বস্ত্রাভাব দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আমি কাপড়ও পাঠাইয়া দিতাম। তিনি ম্যাড্‌গড্‌কারের ১০০০৲ টাকা পাইয়াও আর্থিক ব্যাপারে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। আমিও যাহা পাঠাইতাম, তাহা তাঁহার প্রয়োজনের তুলনায় অতি যৎসামান্য। আজ বিস্ময়বোধ হয়—জাতির নিকট হইতে কতটুকু দান গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত তথা বিশ্বের মানবজাতির জন্য কি অসাধারণ প্রতিভার মহাদানই না রাখিয়া গেলেন!

এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের 'Soul of India' নামে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাহা হাতে পাইয়াই আমায় জানাইলেন—ভগিনী নিবেদিতার "My Master as I saw him"

পুস্তকখানিও তাঁহার নিকট যেন প্রেরণ করা হয়। আরও তিনি চাহিলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদ। তিনি ভবিষ্য বিরাট্ বিশ্বকর্ম্মের জন্য দেশের সাময়িক বিপ্লববাদের অন্তরালে নিজেকে কিভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার পত্রের ছত্রে-ছত্রে তাহা প্রকাশ পাইত। আমি ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্কেতগুলিই বড় করিয়া ধরিতাম, আর তাঁর বৈপ্লবিক নির্দ্দেশগুলি অনেক সময়ে বিপ্লবীদের জানাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম।

এই সময়ে রাসবিহারী বসু আমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার নিবিড় সম্বন্ধের কথা বিদিত হইলেন। আমার নিকট আত্মসমর্পণযোগের কথা তিনি তন্ময়চিত্তে শ্রবণ করিলেন ও শ্রীঅরবিন্দের পত্র হইতেই automation তত্ত্বটি আহরণ করিয়া, তিনি বিশেষভাবে উহাই তাঁহার হৃদয়ে মর্ম্মগত করিয়া লইলেন। ইহার পর এই 'automation' বা যন্ত্র-সাধনা তাঁহার জীবনে কিভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ভারতের রাষ্ট্র-সাধনার ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে চিরদিন অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

রাসবিহারী যন্ত্রীর হাতের যন্ত্রের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই তিনি বসন্তকুমার বিশ্বাসকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে নগরপ্রবেশকালে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তিনি আহত হইলে, উৎসব বন্ধ, দিল্লীর দরবার পণ্ড হইয়া যায়। আজ বলিতে বাধা নাই যে, এই বোমা নিক্ষেপ করেন নারীবেশে তরুণ বসন্তকুমার, আর রাসবিহারীই ছিলেন পার্থসারথির মত তাহার পরিচালক ও পৃষ্ঠরক্ষক। এই ঘটনার জন্য আমরা শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ

গ্রহণ করি নাই ; কিন্তু ঘটনান্তে তিনি খুশী হইয়াই যে কথা লেখেন, তাঁর পত্র হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"I welcome it as a sign of some preliminary effectiveness through you. In this direction, in which hitherto everything has gone against us, also as we have proof of several······that the quality of your power and your work are greatly improving in effectiveness and success."

অর্থাৎ "তোমার ভিতর দিয়া কিছু প্রাথমিক কার্য্যকারিতার লক্ষণরূপে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। এই দিকে, যেখানে এতাবৎ সবই আমাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে, সে ক্ষেত্রে তোমার শক্তি ও কর্ম্মের গুণোৎকর্ষের কয়েকটি প্রমাণের মধ্যে ইহা অন্যতম—তোমার কর্ম্ম কার্য্যকারিতায় ও সাফল্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।" *

রাসবিহারী বসু ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির সাহায্যে ধীর পদে আমরা বিপ্লবক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এদিকে রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দকে পাঠান হইল। তিনি পুনরায় আমায় পত্রযোগে জানাইলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে তাঁহার জন্য কিছু অর্থ ভিক্ষা করিতে। আমি শ্রীঅরবিন্দের পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেশবন্ধু অনেকক্ষণ

* এ বিষয়ে আরও নিগূঢ় উপদেশপূর্ণ যে দীর্ঘপত্র শ্রীঅরবিন্দ সজ্যগুরু শ্রীমতিলালকে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের গভীর দৃষ্টি ও বাংলায় গুপ্তবিপ্লবসাধনায় তাঁর সক্রিয় নেতৃত্বেরই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থলেখক সজ্যগুরু তাহা এক্ষেত্রে যে কোন কারণে হউক, উল্লেখ করেন নাই। উহা তাই আমরা এ স্থানে অনুদ্ধৃতই রাখিলাম।- প্রকাশক

ভাবিলেন, তাহার পর আর একদিন আমায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বলিলেন। আমি যথাকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ "সাগরসঙ্গীত" কাব্যগ্রন্থখানি বাহির করিয়া বলিলেন "শ্রীঅরবিন্দ যদি ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দেন, তবে আমি সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে এই কর্ম্মের জন্য দিব।" শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলে, তিনি "সাগরসঙ্গীত" গ্রন্থখানি চাহিয়া পাঠাইলেন। মিত্রাক্ষরে ও অমিত্রাক্ষরে সাগরসঙ্গীতের দুই প্রস্থ ইংরাজী অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দই করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু এই বাবদ উপরোক্ত অর্থসাহায্য ও যথাকালে করিয়াছিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট বাংলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। মুষলধারে বৃষ্টি-বর্ষণের বিরাম নাই। কূপ-তড়াগ-পুষ্করিণী ভরিল। দামোদর নদে প্রবল বন্যা দেখা দিল। পূর্ব্বকূলের অধিবাসিবৃন্দ গৃহহীন হইল। বাংলার বিপ্লবী তরুণগণ সেবাব্রতে তৎপর হইলেন। বি. কে. লাহিড়ীর উদ্যোগে উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঢাকার শ্রীমাখনলাল সেন সেবাকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম। এই সময়েই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহিত আমার প্রথম পরিচয়। এই বাঘা যতীনের কথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমি প্রথম শুনিয়াছিলাম। তিনিও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বীর। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির সম্বন্ধে এইক্ষেত্রে উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। বর্দ্ধমানের কাজে আত্মনিয়োগ করার কালে আমি দারুণ ম্যালেরিয়া-রোগাক্রান্ত হই। বেহুঁশ জ্বরাক্রান্তাবস্থায় আমি অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্কের উদ্যোগে বর্দ্ধমান হইতে চন্দননগরে নীত হই। আরোগ্যলাভ করিলে

পূজার পর বিপ্লবিগণের এক সভায় স্থির হয় যে, আমায় ইন্দোচীনে যাইতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরিত রিভলভারগুলি নষ্ট হওয়ায় এবং পণ্ডিচারী হইতে অস্ত্রসংগ্রহের কাজ বিশেষ অগ্রসর না হওয়ায়, ইন্দোচীন হইতে প্রচুর অস্ত্রাদি যাহাতে চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছায়, তাহার আয়োজন আমাকেই করিতে হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণযোগ সেদিন আমায় পাইয়া বসিয়াছে। এ যোগে জীবনের মমতা রাখিতে নাই। আমি ভাবিয়া স্থির করিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদন পাইলে, আমি ইন্দোচীনে গমন করিব। বন্ধুদের এই কথা স্পষ্ট জানাইলাম। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা শেষ হইলে, আমি কলিকাতায় রওনা হইলাম। আমায় পুরা-দস্তুর সাহেব সাজান হইল। সুচিক্কণ গুম্ফরাজি বিসর্জ্জন দিয়া মুখমণ্ডলের শ্রীপরিবর্ত্তন করা হইল। সুদর্শন চট্টোপাধ্যায় আমার আর্দ্দালী সাজিয়া মাদ্রাজ মেলে আমায় তুলিয়া দিল। মাদ্রাজ ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে, আমার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু পার্থসারথির বাসায় গিয়া উঠিলাম। প্ল্যাট্‌ফরমে আত্মকৃত অপরাধে যে বিপদ্ ঘনাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহাতে এই ক্ষেত্রে নিরাপদ্ বিশ্রাম সম্ভবপর হইল না। মাদ্রাজের প্ল্যাট্‌ফরমে গাড়ী পৌঁছিলে এক ব্যক্তি আমায় যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—আমার নাম M. Ray (এম্‌, রে), কলিকাতার চুণাগলি অথবা চৌরঙ্গীতে আমি বাস করি না, চন্দননগর আমার বাসস্থান এবং আমি একজন হিন্দু—এই সংবাদ বিদ্যুদ্‌গতিতে পুলিসের নিকট গিয়া পৌঁছায়। অল্পকাল মধ্যে পার্থসারথির বাড়ীটি পুলিস কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়। আমায় খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির করিয়া পার্থসারথি ষ্টেশনে এক গাড়ীতে তুলিয়া দেন। তারপর অতি প্রত্যূষে

পণ্ডিচারী যখন পৌঁছাই, তখন প্রবল বৃষ্টিধারা নামিয়াছে। আ
সাহেবী পোষাকে সরাসরি শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনে যাওয়া যুক্তি
মনে করিলাম না। পার্থসারথির জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গ
এই সময়ে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে পণ্ডিচারীতে বাস করি
ছিলেন। তাঁহারই নিকট গিয়া উঠিলাম। তিনিও আমায় একটি
কালহরণ করিতে না দিয়া, শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনে পৌঁছাই
দিলেন। গুপ্তচরেরা আমায় দেখিল—কিন্তু কে একজন সা
আসিয়াছে—এই সংবাদই বৃটিশ পুলিস অফিসে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীঅরবিন্দের গৃহে প্রবেশ করিতেই যে মাদ্রাজী যুবা সম্
পড়িল, তার নাম শুনিলাম—অমৃত। সে আমায় বিজয় নাগের সা
দেখা করাইয়া দিল। পরে আসিল নলিনী, মণি ও সৌর
সকলেই আমার পরিচিত বন্ধু। আমার সাহেবী বেশ দেখিয়া সক
সকৌতুকে তারিফ করিল। শেষে শ্রীঅরবিন্দ ঘর হইতে বা
হইলেন। আমি নতজানু হইয়া তাঁর চরণে প্রণত হইতে গিয়া সা
পোষাকে স্থূলতঃ বাধিল। তিনি আমায় দুই বাহু দিয়া জড়াই
মস্তক আঘ্রাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নিরাপদে আসিয়াছ?"

আমার সকল কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন "সা
সাজিয়া গোপনে আসিতেছ, নামটাও তো ভাঁড়াইতে হয়। তুমি
বলিয়া পরিচয় দিবার গর্ব্বটুকুই যদি রহিল, তো সাহেব সা
প্রয়োজন কি?" অপ্রস্তুত আমি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজে
ধিক্কার দিলাম। এবার তাঁহার নির্দ্দেশে দেড়মাস তাঁহারই সান্নি
থাকিতে হইল, ইন্দোচীনে যাওয়ার তাঁহার আদেশ মিলিল না।

* *

*

॥ ছয় ॥

পণ্ডিচারীতে বাসকালে আমরা শ্রীঅরবিন্দ নাম সংক্ষিপ্ত রিয়া তাঁহাকে "অরো" বলিয়া অভিহিত করিতাম। এই ম্বাধন অতিশয় আদরের সহিত করিতাম। এই "অরো" মার নিকট ক্ষুদ্র ছিলেন না, তাঁহার সমুন্নত মহিমা আজিও ভব করি, বিস্মিত হই। অরোর সঙ্গে এই সময়ে আমরা রাত্র অতিবাহিত করিয়াছি। মধ্যাহ্নভোজনের পরে তিনি রান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেন। যোগসাধনার মধ্য দিয়া মাদের জীবনকে নূতন ভঙ্গীতে ঢালিয়া লইবারই যেন তিনি লো ধরিতেন। আলোচনা দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া চলিত। সারা রাত থা দিয়া যেন কাটিয়া যাইত, আমাদের হুঁস থাকিত না। তের পাখির ডাকে নিজ-নিজ শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইতাম। কি অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ, সে কি গভীর স্নেহডোরে মাকে বাঁধিবার অনুপ্রেরণা!

আমি বাল্যকাল হইতে নিরামিষাশী। পণ্ডিচারী আসিয়া খিলাম—মৎস্য ও মাংস ভিন্ন দুই-বেলা আহারের অন্য ব্যবস্থা ই। আমি কয়েকদিন অন্নের সঙ্গে আলুসিদ্ধ খাইয়া উদরপূর্ত্তি রতে লাগিলাম। অরো নিরপেক্ষ ভাবেই হাসিতেন। মণি, জয়, নলিনী প্রভৃতি পরিহাস করিয়া বলিতেন "এমন করিয়া দিন চলিবে? মৎস্য, মাংস খাইলে আপনি কি জাতিচ্যুত বেন?" অরোর মুখে কিন্তু কথা ছিল না—তিনি ভোজনকালে । রঙ্গরহস্যে সময় কাটাইয়া দিতেন; আমি কিন্তু তাঁহার

বাণী বুঝিয়া লইলাম। অতীতের সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্তি দিতেই তাঁর অনুপ্রেরণা অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিলাম। বিজয় প্রভৃতির বাক্য উপলক্ষ্য বলিয়া মনে হইল। আমি সেই দিনই ভোজনকালে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া বসিলাম "আজ হইতে নিরামিষাশী আমি আর নহি। অরোর যাহাতে রুচি, তাহাই আমার গ্রহণীয় হইবে।" সহতীর্থেরা উল্লসিত হইয়া বলিল "সাবাস্ আপনাকে—আপনার সংস্কার, আচার ও নীতি অরোই ভাঙ্গিয়া দিলেন সন্ধ্যা হইতেই আপনার খাদ্যপাত্রে সমুদ্রমৎস্য দেওয়া হইবে।"

তাহাই হইল। রাত্রে ভোজনপাত্রের সম্মুখে বসিয়া দেখিলাম—ভাতের সঙ্গে এক বাটি মাছের ঝোল দেওয়া হইয়াছে আবাল্যের সংস্কার জ্ঞানতঃ ভঙ্গ করিলাম বটে; কিন্তু অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অরো একবার আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। বেদনাভরা আঁখি দুটি আমার দুঃখে যেন দ্রব হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন আমায় নূতন করিয়া গড়িতে, অতীতের সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম "আমি আজ হইতে মৎস্য-মাংসভোজী হইয়াছি।" তিনি হাসিলেন। সেই হাসির মধ্যেই আমার সিদ্ধান্তের সমর্থন পাইলাম। সেদিন অন্নগ্রাস মুখে উঠিল বটে কিন্তু তৃপ্তি পাইলাম না। ভোজনান্তে বারান্দায় বসিয়া তিনি আত্মসমর্পণের সাধনার কথা বিশদভাবে বলিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম—সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াই একের শরণ লইতে হয়। আমিও তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এবার পণ্ডিচারীতে আসিয়াছিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে ফরাসী পুলিস-কমিশনার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজে মোটঘাট লইয়া পার্থসারথির সকাশে

গিয়াছিলাম। আমি কিন্তু গোপন পথ দিয়া পলাইয়াছি; তারপর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সহিত শ্রীঅরবিন্দের ভবনে প্রবেশ করায় ও ইংরেজ পুলিস সম্ভবতঃ ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে তদন্ত করিতে বলায়, পুলিস-কমিশনারের আবির্ভাব। বন্ধুরা সকলেই আমায় গোপন দ্বার দিয়া কিছুক্ষণ দূরে থাকিতে বলিলেন—কমিশনার সাহেব বাড়ী খানাতাল্লাসী করিয়া প্রস্থান করিলে, পুনরায় বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই চলিবে। এইরূপ পরামর্শকালে অরো আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া, তাহারই অর্দ্ধ ভাগ গায়ে জড়াইতেন। পায়ে এক যোড়া চটিজুতা থাকিত। সেই সৌম্যস্নিগ্ধ মূর্ত্তি ভুলিবার নয়। তখন তিনি শীর্ণকায় ছিলেন—কিন্তু তাঁহার চক্ষে ছিল অপরূপ দীপ্তি, ভাস্বর মুখমণ্ডল। মৃদু হাসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিব পুলিস কমিশনারকে ?" কিন্তু আমায় আর কিছু বলিতে হইল না; তিনি আমার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, তারপর অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পুলিস-কমিশনারকে তিনি আমার কথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া বলিলেন। সব কথা শুনিয়া কমিশনার সাহেব কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন "চন্দননগর হইতে যে ভদ্রলোক আপনার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত আপনার সম্পর্ক কি?" তিনি স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন "He is my disciple." 'তিনি আমার শিষ্য।' কমিশনার সাহেব করমর্দ্দন করিয়া হাস্যমুখে প্রস্থান করিলেন। অরো আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "সব চুকিয়া গেল, তুমি এখন আমার নিকট নিরাপদেই বাস করিতে পার।"

এই সময়ে দেড়মাস তাঁহার নিকটে বাস করি। মধ্যে একখানি প্রশস্ত গৃহে নলিনী, মণি ও সৌরীন বাস করিত। শ্রীঅরবিন্দের সম্মুখস্থ কক্ষে বিজয়ের সহিত বীরেন বলিয়া একটী যুবক বাস করিত। ইহার সম্বন্ধে পরে কিছু বলিতে হইবে।

অরোর মুখে ভারতের পুরাণেতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা শুনিলাম। বেদের মর্ম্ম তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইত। উপনিষৎ ও গীতার সত্য মর্ম্ম অন্তর দিয়া বুঝিয়া লইলাম। ভারতের রাষ্ট্র-জীবনের বহু পরিচয় মিলিল। দেশনেতৃপুরুষগণের পরিচয় পাইলাম। অরো এই সময়ের নিজের বাল্যজীবনের কথাও কিছু বলিয়াছিলেন। আমি তাহা খাতায় টুকিয়া লইয়াছিলাম। সে কাহিনীটুকু আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি।

আমার ইন্দোচীনে যাওয়া বন্ধ হইল। বিপ্লবী বন্ধুদের অনুরোধানুযায়ী রিভলভার আনিবার প্রশ্ন উত্থাপন করা মাত্র তিনি বলিলেন "ভারতবর্ষ রাজসিকতার মধ্য দিয়া জাগিবে না; ভারতের একদল মানুষকে গীতার পার্থসারথির কথা শুনিতে হইবে। ভারতের নেতৃপুরুষগণ হইবেন গীতার মানুষ। তাঁহাদের গুণাতীত হইতে হইবে। তবেই আসিবে ভারতের মুক্তি।" এই সময়ে তিনি স্পষ্ট করিয়াই আমায় জানাইলেন—অতঃপর রাজসিক কর্ম্মে আমি যেন প্রবৃত্ত না হই। তিনি ভারতকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন। আমিও তাঁর নির্দ্দেশ প্রাণপণে পালন করিব বলিলাম। তিনি আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন "আমার কাজ তোমার কাজ; তোমার কাজও আমার বলিয়াই গ্রহণ করিও।"

এই সময়ে তিনি রাত্রে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেন, আমরা

লে তাঁর সঙ্গী হইতাম। আমরা "পীয়ারে"র শেষ সীমানায় গিয়া বসিতাম। জেটীকে পণ্ডিচারীর লোকে "পীয়ার" বলে। াৎস্নাবিধৌত সমুদ্রতরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি অতিশয় াকিত হইতেন। আমি গান গাহিতাম, সুরেশ ও মণি—তাহারা ত; অরো তাল দিতেন। সে রঙ্গরহস্যের কথাগুলি স্মরণ রলে আজিও তৃপ্তি পাই। মনে আছে—একদিন অলিন্দে ায়া তিনি আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন—আমায় ইচ্ছা-ক্তর কথা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন "ইচ্ছা সর্ব্বব্যাপী, এই দেখ মি will করিব, চিলগুলি তৎক্ষণাৎ ভিন্নমুখে উড়িয়া যাইবে।" াই তাঁহার ইচ্ছামাত্র চিলগুলি ভিন্নমুখী হইল।

যেদিন বিদায়ের পালা আসিল, সেদিন কি ভাবে আমি লায় ফিরিয়া যাইব—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তিনি ক্ষণ চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন "যে ভাবে তুমি ইংরেজ সের চক্ষে ধুলি দিয়া চলিয়া আসিয়াছ, তোমায় পাইলে হারা সহজে তোমায় ছাড়িবে না। তোমাকে গোপনেই ফিরিয়া তে হইবে।" আমি তাঁহার আদেশানুযায়ী ফরাসী কোম্পানীর ষ্টীমার বাংলায় আসা-যাওয়া করে, তাহাতে রওনা হইলাম। রপর নীলাম্বুরাশি বিদীর্ণ করিয়া কলিকাতার বন্দরে যেদিন ার ভিড়িল, সেইদিনই রাজাবাজার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত । আমার শিষ্য অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্কের সহিত সেখানে য় ২০ জন বিপ্লবী ধরা পড়ে। আমি ঐ রাত্রে রাজাবাজার তে গিয়া অন্তরের সতর্কৈষণায় সহসা গতির মোড় ফিরাইয়া নগরেই উপনীত হই। অরোর আশীর্ব্বাদেই অন্তরে প্রেরণা য়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি বলিয়া মনে করিলাম।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের নূতন বাণী লইয়া "আর্য্য" পত্র প্রকাশিত হইল। "বন্দেমাতরম্"-এর ঋষি "কর্ম্মযোগিন" ও "ধর্ম্মের" পর "আর্য্যে" অপূর্ব্ব অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "আর্য্য" বাহির করার পূর্ব্বে চন্দননগরে ডেপুটি নির্ব্বাচনের আন্দোলনে আমাদের শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশক্রমেই যোগদান করিতে হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের চন্দননগরের ফরাসী নির্ব্বাচনে আমরা যে জয়লাভ করি, তাহার মূল শিক্ষা ও প্রেরণা এইখানেই নিহিত ছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ফরাসী ভারতীয় ডেপুটিনির্ব্বাচনে মঃ লে-ম্যার, মঃ পল ব্লুজেঁ ও মঃ পল রিশার, এই তিনজন প্রতিনিধিপদপ্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা এই সময়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মঃ পল রিশারকে ভোটযুদ্ধে জয়ী করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু মঃ লে-ম্যারই বিজয়ী হইয়া ডেপুটিরূপে নির্ব্বাচিত হন। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন :

"The election is over, or what they call an election—with the result that the man who had the fewer real votes, has got the majority."

অর্থাৎ 'নির্ব্বাচন অথবা ইহারা যাহাকে নির্ব্বাচন বলে, তাহার শেষ হইয়াছে। ফলে যিনি সবচেয়ে কম সত্য ভোট পাইয়াছিলেন, তিনিই সবচেয়ে বেশী ভোটের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।'

তাঁহার পত্র হইতে আরও জানা গিয়াছিল যে, সেখানে মঃ লে-ম্যার মাত্র তিনশত ভোট পাইয়াছিলেন, সেখানে ৩,৩০০ শত লিখিত হইয়াছিল। ফরাসী ভারতের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এই কটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তিনি সেই পথেই আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাকেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি অর্থের কথা পুনরায় জানাইলেন। তিনি লিখিলেন :

"My present position is that, I have exhausted all my money along with Rs. 60/-and I am still in debt for the Rs. 130/- due for the old rent. I do not like to take more money from Richard, for he has sold one fourth of his wife's fortune (a very small one) in order to be able to come and work for India."

"তোমার ৬০্ টাকা সহ আমার সব টাকাই আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। পুরাতন বাড়ী ভাড়ার দরুণ আমি এখনও ১৩০্ টাকা ঋণগ্রস্ত। মঃ রিশারের নিকট আর টাকা লইতে আমি রাজী নাই। তিনি তাঁর স্ত্রী-ধন হইতে (যাহার পরিমাণ খুবই অল্প) এক-চতুর্থাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহা দিয়া ভারতে আসিয়া ভারতের কার্য্য করিবার জন্য।"

এই সময়ে বাগান-বিক্রয়ের তাঁহার অংশস্বরূপ ৫০০্ টাকার তাগিদ দিবার জন্যও তিনি আমায় পত্র লেখেন। কোন বিশিষ্ট নেতার নিকট হইতে দেশের গচ্ছিত টাকা আদায়ের দুঃসাধ্যতা উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা লিখিলেন :

"This habit of defalcation of money for noble and philanthrophic purposes in which usually the ego is largely the beneficiary, is one of the curses of our movement and so long as it is continued, Lakshmi will not return to this country. I have sharply discontinued all looseness of the kind myself and it must be discouraged henceforth wherever we meet it. It is

much better and more honest to be a thief for our own personal benefit than under these holy masks."

অর্থাৎ "উচ্চ ও পরহিতের উদ্দেশ্য দেখাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করার এই অভ্যাস—যাহাতে প্রধানতঃ মানুষের স্বার্থমূলক উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হইয়া থাকে—তাহা আমাদের আন্দোলনের অন্যতম অভিশাপস্বরূপ ; আর ইহা যতদিন না দূর হয়, ততদিন ভারতে লক্ষ্মীদেবীর পুনরাবির্ভাব হইবে না। আমি নিজে আমার এই শ্রেণীর সকল ঢিলেমি তীব্রভাবে বন্ধ করিয়াছি এবং যেখানেই ইহা আমরা দেখি-না কেন, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের সোজাসুজি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে চোর হওয়াও বরং ঢের ভাল—এইরূপ পুণ্যচিহ্নের আবরণে তাহা হওয়ার চেয়ে তাহা ঢের বেশী সাধু আচরণ হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘদীন অর্থসঙ্কটের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সঙ্কটে কোনদিনই তিনি প্রতিহত হন নাই। ভাগবত কর্ম্মের জন্য অর্থাগমের পথ চিরদিন মুক্ত বলিয়াই তাঁর ধারণা ছিল। এই সময়ে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ-সংগঠনের জন্য অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমায় স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন :

"What you have to do, is to make some real arrangement, not a theoretical arrangement, by which the durben of my expenses may be shifted off your shoulders, until I am able to make my own provision. Meanwhile get me Rs. 150/- and the Rs 500/- due to me (Garden money) and if afterwards we can make no other arrangement, we shall then have to consider the question again."

অর্থাৎ "তোমায় যাহা করিতে হইবে, তাহা হইতেছে একটি বস্তুতন্ত্র ব্যবস্থা করা—কোন কল্পনামূলক ব্যবস্থা নয়—যাহাতে আমার ব্যয়ভার তোমার স্কন্ধ হইতে সরিয়া যায়—আমার নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত। ইতোমধ্যে ১৫০৲ ও বাগানবিক্রয়ের দরুণ প্রাপ্য ৫০০৲ টাকা আমার পাওয়ার ব্যবস্থা কর। পরে আর কোন ব্যবস্থা যদি আমরা না করিতে পারি, তাহা হইলে এই প্রশ্নটি আবার বিবেচনা করিতে হইবে।"

তাঁহার পত্র পড়িয়া আমি নিরতিশয় চিন্তান্বিত হইলাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দাবী পূরণ করিতে আমি পারিয়াছিলাম। এইজন্য আমার কৃতিত্ব অপেক্ষা তাঁহার প্রেরণারই মূল্য অধিক বলিয়া আমি মনে করি।

আমি যখন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট ছিলাম, সেই সময়ে বীরেন নামক এক যুবক বিজয় নাগের সঙ্গে থাকিত—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৌরীন্দ্রনাথ তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই আমায় বলিয়াছিলেন এবং সে ব্যক্তি যে পুলিসের একজন গুপ্তচর, এইরূপ উক্তিও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এইজন্য আমি সতর্ক থাকিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—

"Then for important subjects. You write about Biren being here. I do not hold the same opinion about Biren as Sourin etc do, who are inclined towards a very black interpretation of his character and actions···I fail to find in him, looking at him spiritually, those ineffable blackness, which were supposed to dwell in him, only flightiness, weakness, indiscretion, childishness, swatic

impulsiveness and self-will and certain undesirable possibilities present in many young Bengalees, in a certain type indeed, which has done much harm in the past. All these have recently much diminished and I hope even to eradicate them by the Yoga. In fact, the view of his presence here forced in me by that which guides us, is that, he was sent here as the representative of this type and that I have to change and purify it. If I can do this in the representative, it is possible in the future to do so in the class and unless I can do it, the task I have set for myself for India will remain almost too difficult for solution. For as long as that element remains strong, Bengal can never become what it is intended to be."

"এবার কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে অর্থাৎ তুমি বীরেনের এখানে থাকা সম্বন্ধে লিখিয়াছ। সৌরীন প্রমুখ যারা তার চরিত্র ও কাজ সম্বন্ধে একান্ত কালিমাখা ব্যাখ্যা দিতে চায়, আমি তাহাদের সঙ্গে একমত নই। অর্থাৎ বীরেনের ঐ সকল চরিত্রগত দোষ আমার অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে পড়ে নাই। তাহার চাপল্য, দুর্ব্বলতা, অবিবেচনা, ছেলে মানুষী, একটা সাত্ত্বিক ভাবপ্রবণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং এরূপ কয়েকটী অবাঞ্ছনীয় সম্ভাবনা দেখা যায় বটে, যাহা এক শ্রেণীর বহু বাঙালী তরুণদের মধ্যে বিদ্যমান এবং অতীতে যাহা যথেষ্ট অনিষ্টই করিয়াছে—এই সকল দোষ এখন অনেকটা কমিয়াছে এবং আমি আশা করি, যোগের দ্বারা ঐগুলি একেবারেই নির্মূল হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ যিনি আমাদের নিয়ন্তা, তাঁরই দৃষ্টিযোগে দেখিয়া মনে হয়, সে আমার কাছে প্রেরিত হইয়াছে সেই শ্রেণীর

তিনিধিস্থানীয়রূপে—আর তাহাকে আমায় পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। একটি প্রতীকের মধ্য দিয়া যদি ইহা কাজ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র শ্রেণীটির মধ্যেই তাহা করা সম্ভবপর হইবে। আর তাহা যদি আমি না করিতে পারি, তবে যে কাজ আমি ভারতের জন্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সমাধান করা দুঃসাধ্য হইবে। আর যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ ধাতুর বিত্র বলবৎ রহিয়া যাইতেছে. ততদিন পর্য্যন্ত বাংলা যাহা হইবার জন্য চিহ্নিত, তাহা হইতেও সে পারিবে না।"

বীরেন সম্বন্ধে তাঁহার এই আকুলতার মূল্য নিশ্চয়ই অনুধাবনীয়। মানুষকে বড় করিয়া দেখার প্রবৃত্তি যে তাঁহার মধ্যে কতখানি ছিল, ইহাতেই তাহার পরিচয় মিলিবে। যদিও বীরেন্দ্রনাথের সংবাদ আর আমরা রাখিতে পারি নাই, তথাপি শ্রীঅরবিন্দের বাঙালী জাতির তথা ভারতের অভ্যুত্থান ও জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তনকল্পে যে আন্তরিকতা, তাহা চিরদিন আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।

শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই বাংলার বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার নিকট যে সকল কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে বাংলার বিপ্লবিগণ তাঁহাকে রাষ্ট্রনেতার আসন দিতে অতঃপর অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল, কিন্তু আমি তখন যে অবস্থায়, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তিনি সর্ব্বদাই জানাইতেন—বৈপ্লবিক কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে যেন আমি বিরত থাকি। তিনি এই সময়ে স্পষ্ট ভাষায় আমায় লিখিলেন:

"You must reali e that my work is a very vast one and that I must in doing it come in close contact with

all sorts of people including Europeans, perhaps ev officials, perhaps even spies and officials "

অর্থাৎ "তোমায় উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমার কা অতি বৃহৎ, আর এই কার্য্য কবিতে গিয়া বহুবিধ লোকে সংস্পর্শে আমায় আসিতে হইবে—তন্মধ্যে ইউরোপীয়, এমন গুপ্তচর ও রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত থাকিতেও পারে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি একজন ফরাসী কর্ম্মচারীরও নাম করি ছিলেন—চন্দননগরে তিনি কর্ম্মোপলক্ষ্যে এই সময়ে থাকিতেন। আ আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, সে ব্যক্তি একেবারেই বুদ্ধিহী কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি তাঁহার অসাধারণ। শ্রীঅরবিন্দ একদিন ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "He is a queer so of fool"—সে এক বিচিত্র ধরণের বোকা লোক।'

স্পষ্টই বুঝিলাম—মঁসিয়ে রিশারের আগমনের পর হইতে শ্রীঅরবিন্দ নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া বাংলার বৈপ্লবিক ক হইতে দূরেই থাকিতে চাহিতেছেন—আমাকেও তাঁহার স হওয়ার জন্য প্রতি পত্রে নির্দ্দেশ দিতেছিলেন। তিনি অতঃপর নীতি ধরিয়া চলিতে চাহিতেছেন, তাহার আভাস পরব কয়েক ছত্রে সমধিক পরিস্ফুট হইবে :

1. It might be known among our friends that r whole action is about to be such as I have described, that they may not again repeat that kind of mistakes.

2. Those immediately connected with me, must aloof physically from Tantricism—because of t discredit it brings and intangible by coil minded perso

3. Biren and others of that kind must be ma

to understand that Tantra for us is discontinued until further notices, which can be only in the far future.

4. The written basis of Vedantic yoga has now become impossible and must be entirely changed and as far as possible, withdrawn from circulation."

ইহার মর্ম্মার্থ—"আমার বন্ধুদের জানা উচিত যে, অতঃপর আমার সমগ্র কর্ম্ম যেমন বলিয়াছি, সেইরূপই হইবে, যাহাতে যে ভুল তাহারা করিয়াছে, তাহা আর পুনরায় না ঘটে।

যাহারা প্রত্যক্ষভাবে আমার সহিত জড়িত, তাহাদের তান্ত্রিক কর্ম্ম হইতে স্থূলতঃ বিরত থাকিতে হইবে—কারণ তাহাতে অপবাদ ঘটায়।

বীরেনের মত লোকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা তন্ত্রসাধনা পুনরায় না নির্দ্দেশ পাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছি; আর সে পুনরারম্ভ সুদূর ভবিষ্যৎ ছাড়া হইতে পারে না।

বেদান্তযোগের সম্বন্ধে লিখিত সন্দর্ভ আছে। তাহা এখন অচল হইয়াছে। উহার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন এবং যথাসম্ভব তাহার প্রচার প্রত্যাহৃত করিয়া লইতে হইবে।"

তাঁহার পত্র পড়িয়া বাংলার বিপ্লবীরা কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সময়ে পণ্ডিচারীতে ধর্ম্মসাধনার ভিত্তির উপর একটা নূতন সাধকমণ্ডলী গড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মঁসিয়ে রিশারের ইচ্ছানুযায়ী এই সমিতির ফরাসী নামকরণ হইয়াছিল "L'ide´ Nouvelle" (The New Idea)—এই সমিতি কিন্তু অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই।

*

* *

॥ সাত ॥

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচাবীতে বাসকালে শ্রীঅরবিন্দেব সহিত মাতা মৃণালিনী সম্বন্ধে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিব। মাতা মৃণালিনী সম্বন্ধে আমি সকল তথ্য অবগত হই বর্দ্ধমানের সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত থাকার সময়েই। বাঘা যতীনেব মুখেই শুনি—মাতা মৃণালিনীর কথা। ভূপালবাবু* তখন তাঁহাকে স্বীয় গুরু মুক্তানন্দ স্বামীব আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মুক্তানন্দ স্বামীব নিকট মাতা মৃণালিনী এই সময়ে যোগশিক্ষা কবিতেছিলেন। স্বামীজী ডিব্রুগড়ে থাকিতেন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ যে তিনটি "পাগলামীব" কথা মাতা মৃণালিনীকে জানাইয়াছিলেন, স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায়, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই তিনি ডিব্রুগড়ে যোগশিক্ষায় নিবত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীঅববিন্দ মাতা মৃণালিনীকে তাঁহার পাগলামীর কথা শুনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ হইতে হয় বলিয়া পত্নীকে তদনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লওয়ার সম্ভব হয় নাই। আমিই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মাতা মৃণালিনীকে প্রস্তুত করিয়া লইতে বলি। শ্রীঅরবিন্দ তদুত্তরে বলেন যে, যদি তাঁহার পত্নী তাঁহার লিখিত তিনটি প্রসিদ্ধ পাগলামীর লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে পারেন, তবে পণ্ডিচারীতে আসিয়া, মৃণালিনী দেবীর পক্ষে বাস করা দুঃসাধ্য হইবে না

* মৃণালিনী দেবীর পিতৃদেব।

আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রমুখাৎ এই কথা পণ্ডিচারী হইতে শুনিয়া আসিয়া মাতা মৃণালিনীর ভ্রাতা শিশিরকুমার বসুর সহিত দেখা করি। শিশিকুমারের মুখে মাতা মৃণালিনী সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পণ্ডিচারী যাইতে সম্মতা হন। কিন্তু ভবিতব্য তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল। তাঁহাকে পণ্ডিচারী প্রেরণ করার সকল আয়োজন যখন শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণবিয়োগের কথা শ্রবণ করি। এই সংবাদ শ্রীঅরবিন্দের নিকট পৌঁছিলে, তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন। তাঁহার হৃদয়ভেদী নিঃশ্বাসে অন্তরের বেদনাই নিঃসৃত হয়। শ্রীঅরবিন্দ দেবী মৃণালিনীকে ধর্ম্মসঙ্গিনীরূপে পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। মাতা মৃণালিনীরও শূন্য হৃদয় ভরিয়া দিবার অপেক্ষা সহিল না, অকালেই তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অপার্থির যোগশক্তিবলে সারা বিশ্বের মানব-চরিত্রের পরিবর্ত্তন আনিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙালী জাতি এবং ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার স্বপ্নভূমির কেন্দ্র। তিনি যোগশক্তির সাহায্যে বিশ্ববাসীকে অসাধারণ চরিত্রে উন্নীত করিয়া জগতে এক দিব্য জাতিগঠনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমায় লিখিলেন—তিনি চাহেন:

"The attempt to apply Knowledge and Power to the events and happenings of the world without the necessary instrumentality of physical action. What I am attempting is to establish the normal working of the siddhis in life."

অর্থাৎ "জ্ঞান এবং শক্তি জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনায় প্রয়োগ করিয়া, প্রয়োজনীয় দৈহিক যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে

কার্য্য করিবার প্রয়াসই আমি করিতেছি। যৌগিক সিদ্ধিগুলিকে জীবনে সহজ ভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিতেই আমি উদ্যত।"

বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য তিনি আরও লিখিলেন:

"………that is, the perceptions of thoughts, feelings and happenings of other beings and in other places throughout the world without any use of information by speech or any other data."

অর্থাৎ "বাক্যযোগে অথবা বাহিরের অন্য কোন প্রকার তথ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সারা বিশ্বের অপর সকল মানুষের এবং অন্য সব স্থানের চিন্তা, সংবেগ ও ঘটনার অনুভূতিলাভ।"

দ্বিতীয়তঃ, "The communication of the ideas, and feelings I select to others (individuals, groups, nations by mere transmission of will-power."

অর্থাৎ "কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই অপরের (ব্যষ্টি, সমষ্টি, অথবা জাতির) অন্তরে আমার নির্ব্বাচিত ভাব ও অনুভূতির সঞ্চারণা।"

তৃতীয়তঃ, "The silent compulsion on them to act according to these communicated ideas and feelings."

অর্থাৎ "অতঃপর এই সমস্ত সঞ্চারিত ভাব ও অনুভূতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার জন্য নীরব বশীকরণেই তাহাদিগকে প্রভাবান্বিত করা।"

চতুর্থতঃ, "The determining of events, activities and results of actions throughout the world by pure silent will-power,"

অর্থাৎ "সারা জগতের সকল ঘটনা, কর্ম্ম এবং ঘটনা ও কর্ম্মের ়রিণামসমূহ নীরব বিশুদ্ধ ইচ্ছাযোগেই নিয়ন্ত্রিত করা।"

তিনি এই সকল কথা ধারাবাহিক ভাবে আমায় পত্রে লিখিতেন। ১ম, ২য় এবং ৩য় পর্য্যায়ের যোগসিদ্ধিগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে গুছাইয়া লইতে না পারিলেও, অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র চতুর্থ পর্য্যায়ের বিষয়টি সংসিদ্ধ করিতে অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা জানাইয়া তিনি লিখিলেন যে, যখন ইহাতে পূর্ণ সাফল্য আসিবে, তখন আমি মনে করিব—

"I have got rid of the past *Karmas* in myself and others."

"আমি নিজেও যেমন প্রাক্তন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি, তেমনি অন্যদেরও মুক্তি দিতে ক্ষম হইয়াছি।"

তিনি কোন্ দিকে যাত্রা সুরু করিয়াছেন, তাঁহার এই সকল পত্র হইতে অনুভব করিলাম। তিনি অতঃপর যোগশক্তিপ্রয়োগেই বিশ্বের যাহা লক্ষ্য, যাহা হিত, তাহাই সিদ্ধ করিবেন, বুঝিলাম। যৌগিক ক্রিয়াকর্ম্মের উপর তাঁহার আস্থা কতখানি ছিল, তাহাও তাঁহার পত্র হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিলেন—

"তুমি যে তান্ত্রিক সাধনা করিতেছ, তাহা দুঃসাহসিক কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে এবং ক্রমশঃ তোমার কর্ম্মে উন্নতি দেখিতেছি, তবুও সর্ব্বপ্রথমে মনে রাখিও—প্রত্যেক কর্ম্মের সাধারণ লক্ষ্য হইতেছে মুক্তি এবং ভুক্তি which Tantriks in all ages have pursued' অর্থাৎ 'যাহাই তন্ত্রসাধকগণ চিরদিন অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন'; কিন্তু যে বিশেষ

অবস্থা এবং ফলের জন্য আমাদের কর্ম্ম করিতে হইবে, তজ্জন্য 'big *Kriyas* or numerous *Kriyas* are not always necessary'—'সর্ব্বদা বৃহৎ ক্রিয়া অথবা বহুক্রিয়া এইজন্য প্রয়োজন হয় না।' অতীতে যেরূপ নিখুঁতভাবে কর্ম্মগুলিকে কার্য্যকরী করিয়াছ, সেইরূপ ভাবেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়।"

তিনি জানাইলেন "তোমার কর্ম্মসাফল্য নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর : 'Mantra & Tantra—Mantra, the mental part and Tantra, the practical part.'—অর্থাৎ 'মন্ত্র ও তন্ত্র।' মন্ত্র হইতেছে—মানসিক অংশ ; আর তন্ত্র হইতেছে কার্য্যকরী অংশ।"

তিনি আমায় বিশেষভাবে সতর্ক করার জন্য জানাইলেন যে, এই কর্ম্ম রাজসিক উত্তেজনা হইতে মুক্ত হইয়া করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও স্মরণ করাইলেন যে, তান্ত্রিক ক্রিয়ায় অঙ্গরক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"*Angarakshana* is as important as *Siddhis*"—'অঙ্গরক্ষণ কর্ম্মসিদ্ধিসমূহেরই মত প্রয়োজনীয়।' তিনি আরও জানাইলেন যে, দুঃখের বিষয়, কলিযুগের তান্ত্রিকেরা সিদ্ধির মোহে অঙ্গরক্ষণ-বিষয়ে অতিশয় উদাসীন। তাহারা সিদ্ধির দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়া "Devils & Bhutas" অর্থাৎ 'দানব ও ভূতগণেরই' শিকার হইয়া পড়ে। অঙ্গরক্ষণের জন্য প্রয়োজন—প্রথমতঃ, যথোপযুক্ত সিদ্ধমন্ত্র এবং সিদ্ধক্রিয়ার সুসংযোগ। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বদা রাক্ষসদের কবলে না পড়িতে হয়, এইজন্য প্রকৃষ্ট সতর্কতাবলম্বন। তিনি লিখিলেন—"আমি এই সকল কথা তোমাকে বলিতেছি এইজন্য যে, যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত না হও। মন্ত্র যতক্ষণ অন্তরের বস্তু না হয়, ততক্ষণ কর্ম্মে বিরত হইয়া মৌন থাকাই ভাল। বেদ ও

তন্ত্র দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। বেদান্তের প্রচার এবং প্রসারতা তুমি নির্ব্বিবাদেই করিতে পার; কিন্তু তন্ত্র সম্বন্ধে সাধকের গোপনীয়তা অতিশয় প্রয়োজনীয়।"

তাঁহার এই সকল পত্র পাঠ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। বলা বাহুল্য, তিনি যে তান্ত্রিক ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন, তাহা বৈপ্লবিক কর্ম্ম। বেদান্তের সাধনায় তিনি স্বয়ং যে স্থানে উঠিয়াছেন, আমাকেও সেই স্থানে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম আমার বিপ্লবী বন্ধুদের নিকট গোপন রাখিয়া, আমি তন্ত্রোক্ত কর্ম্মেই সহযাত্রীদের সহিত আগাইয়া চলিলাম। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বিপ্লব-কর্ম্ম হইতে আমি যাহাতে নিরস্ত হই, সেই দিকেই আমায় পুনঃ-পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মঁসিয়ে পল রিশার মাদাম রিশারের সহিত জাপান যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিলে, "Arya" পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্য" পত্রিকার মধ্য দিয়াই বেদোপনিষদের মূল তত্ত্ব ও ভারতের সাধন-বিজ্ঞান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে প্রচার করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যসাধন কি ভাবে করিবেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি "আর্য্য" প্রসঙ্গে লিখিলেন:

"In this review, my new theory of the Veda will appear, as also translation and explanations of the Upanishads, a series of essays giving my system of Yoga and a book of Vedantic philosophy (not Shankara's but Vedic Vedanta) giving the Upanishadic foundations of my theory of the ideal life towards which humanity must move."

অর্থাৎ "এই পত্রিকায় বেদ সম্বন্ধে আমার নূতন মত, উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, আমার যোগপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী আর বেদান্তদর্শন (শঙ্করের বেদান্ত নয়, পরন্তু বৈদিক বেদান্ত) সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থও প্রকাশ করিব, যাহাতে আমার আদর্শজীবন সম্বন্ধীয় দার্শনিক তত্ত্বের ঔপনিষদ ভিত্তি প্রদর্শিত হইবে—সেই জীবনদর্শনই অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে নিখিল মানবজাতিকে।"

"It will be the intellectual side of my work for the world."

"ইহাই হইবে জগতের জন্য আমার জ্ঞানমূলক কর্ম্মের দিক্।" তিনি 'আর্য্য' পত্রিকাপ্রকাশের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে আমায় লিখিয়াছিলেন। আমি সাধ্যমত কিছু অর্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ চিরদিনই অর্থের দিক্ দেখিয়া হিসাব করিয়া চলিতেন। তাই আবার তিনি লিখিলেন :

"We shall have a sound financial foundation to start with."

অর্থাৎ "সিদ্ধ আর্থিক ভিত্তির উপরই, আমরা কর্ম্ম আরম্ভ করিব।"

পত্রিকাখানি তিনি ইংরেজী ভাষায় ১০০০ কপি এবং ফরাসী ভাষায় ৬০০ কপি প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার হিসাবমত বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে ফরাসী ও ইংরেজী সংস্করণ মিলিয়া অন্ততঃ ৪০০ কপি সংগ্রাহক যদি স্থির হয়, তাহা হইলে ২৪০০৲ শত টাকায় কাগজ বাহির করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে। এই অবস্থায় আমি কত গ্রাহক করিতে পারি,

াহা তিনি জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি দুই শত কপি ার্য্য" বাংলাদেশে যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব, ানাইলাম। তদুত্তরে তিনি পুনরায় লিখিলেন :

"As to the Review, I do not think we can dispense ith the 200 subscribers whom you promise. The nly difficulty is that, if there are political suspects mongst them, it will give the police a handle for onnecting politics and the Review and thus ightening the public."

অর্থাৎ "তুমি পত্রিকার জন্য যে ২০০ জন গ্রাহকের প্রতিশ্রুতি িতেছ, তাহা আমি না ধরিয়া পারি না। তবে মুশকিল এই য, তাহাদের মধ্যে যদি সন্দেহভাজন লোক থাকে, তাহা ইলে উহা পুলিসকে এই পত্রিকার সহিত রাজনীতিকে জড়াইয়া র্বসাধারণের মধ্যে (পত্রিকা সম্বন্ধে) ভীতি-সঞ্চারের সুযোগ িবে।"

"There is one thing about which great care has to be aken that is, there should be no entanglement of his Review in Indian politics or a false association reated by the police, finding it in the house of some olitical suspects they search—for in that case people will e afraid to subscribe."

অর্থাৎ "ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সহিত এই পত্রিকার কোন ংশ্রব না থাকে, অথবা পুলিস এরূপ মিথ্যা সংশ্রব সৃষ্টি করিতে া পারে, ইহা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। সন্দেহভাজন রাজনৈতিকদের গৃহে ানাতল্লাস করিয়া এই পত্রিকা পাওয়া গেলে, এইরূপ সংশ্রব-সৃষ্টি

করার সম্ভাবনা—কারণ সে ক্ষেত্রে লোক গ্রাহক হইতে ভয় পাইবে।"

'আর্য্য' সম্বন্ধে তিনি আমায় এত সতর্ক করিতেন এইজন্য যে, আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে যখন মিশিতাম, তখন তাঁহার কথাই প্রচার করিতাম। তৎকালে তাঁহার লিখিত 'Yoga and its objects' এবং 'Yogic Sadhan' আদালতে বিপ্লবীদের বিচারকালে বহু সময়ে উপস্থিত করান হইত। শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণের মন্ত্র এই যুগে আমি বিপ্লবীদের মধ্যেও প্রচার করিতাম। আমি যে ২০০ কপি "আর্য্য" প্রচারের ভার লইব বলিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ যে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হইবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি আরও স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন "রাজনীতি এবং পত্রিকা একসঙ্গে থাকিলে জনসাধারণ ভয় পাইবে।" তিনি এই কথা বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আরও লিখিলেন "তুমি যে সব গ্রাহক সংগ্রহ করিবে, তারা যেন 'mainly interested in yoga' হয়—অর্থাৎ 'কেবল মাত্র যোগেরই অনুরাগী হয়।' আর তাহারা যেন পুলিসের ফাঁদে পা না দেয়—এই সতর্কোক্তিও তিনি করিতে ভুলেন নাই।

"God save us from all mysteries except those of Tantric yoga."

"তান্ত্রিক যোগ" অর্থাৎ গুপ্ত বিপ্লবতন্ত্রের বিষয় ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রে যেন আমাদের কোন রহস্যময় চোরাগুপ্তির আচরণ না থাকে, ইহা তাঁহার বিশেষ লক্ষীভূত ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মঁসিয়ে পল রিশারের সহিত সম্মিলিত হওয়ার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলার বিপ্লববাদীদের অনুসৃত

াথের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া, তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন
ারিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন। আমাকেও তিনি সেই পথ হইতে
তন্ত্র হওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। আমার প্রতিই তাঁর
এই বিশেষ নির্দ্দেশের কারণ—সেই যে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার
াছে সাধনার আলোক প্রার্থনা করিয়াছি, সেই স্মৃতি তিনি মুছিতে
ারেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার অপেক্ষা শত-সহস্র
অধিক গুণের অধিকারী মানুষ বাছিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু
ীমাহীন অনুরাগের বশেই তিনি আমাকে টানিয়া রাখিলেন।
বিপ্লবদল হইতে কেন তিনি আমায় সরিয়া আসার দাবী করিতেছেন,
তাহা যুক্তি দ্বারাই তিনি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তখন একদিকে
াসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লী হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক
ংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে—সমগ্র বাংলা দেশের তলে-তলে সেদিন
বৈপ্লবিক আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত। অন্যদিকে এই অবস্থায় ইহা হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইলে, যাঁহাদিগকে শ্রীঅরবিন্দের নামে এই কর্ম্মে
আমি উদ্বুদ্ধ করিয়াছি, তাঁহাদের কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে
বলিব? এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে সেদিন অতি বিষম ভাবেই আমি বিচলিত
হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সঙ্কল্পে অবিচলিত।
তিনি তাঁহার কর্ম্মপন্থা তখন দুই ভাগে ছকিয়া লইয়াছেন—একটি
"আর্য্য" পত্রিকার মধ্য দিয়া তাঁহার অধ্যাত্মভাবপ্রচার; অন্যটী
তাঁর ভাষায়—

"The sccond part of my work is the practical, consisting in the practice of yoga, by an ever-increasing number of young men all over the country."

অর্থাৎ "আমার কর্ম্মের দ্বিতীয়াংশ হইতেছে কার্য্যকরী অংশ—ইহা

হইতেছে সারা দেশময় ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় তরুণগণ কর্ত্তৃক যোগের অনুশীলন।”

এইজন্য তিনি পুরাতন তন্ত্রের প্রবাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হইলে যে বিপদ্ বা বিঘ্নসৃষ্টি অনিবার্য্য, তদ্বিষয়ে সাবধান করার জন্য লিখিলেন :

“Do not let any one add to it by associating Vedanta and Tantra together in an inexpressible fashion.”

অর্থাৎ “বেদান্ত ও তন্ত্রকে দুর্ব্বোধ্য ভাবে একত্র মিশাইয়া যেন কেহ এই বিপত্তির মাত্রা না বাড়ায়।” তিনি আরও বলিলেন “তান্ত্রিক কর্ম্মের ক্ষেত্র অতি অপ্রশস্ত; কিন্তু বেদান্ত এমন এক বস্তু, যাহার ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত এবং সকল প্রকার মানুষই বহু ধারায় ইহা প্রকাশ করিতে পারিবে। তন্ত্রের দ্বারা বস্তুতান্ত্রিক জয় লাভ হয়। যদিও বর্ত্তমানে ইহা ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত না হইয়া যাহাতে মানবজাতিই যোগলাভের সুযোগ পায়, তদনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে, তবুও আমার প্রশ্ন—এই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিলে, তুমি কি মনে কর আমাদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? আমার মনে হয়, ইহার সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রথমতঃ, পুরাতন তন্ত্রবাদ বিক্ষিপ্তভাবে ক্রিয়াশীল হওয়ায়, মনুষ্যজাতির উদ্দেশ্যসাধনে আর সহায় হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নূতন তন্ত্রবাদ গোড়ায় বিশুদ্ধভাবে আরম্ভ হইয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইলেও, পুরাতন অহঙ্কারের জের ইহার গতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া ইহার বিকৃতি ঘটিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর বৃহৎ কর্ম্মসিদ্ধির আশা একেবারেই ব্যাহত

হইতেছে। অতএব আমাদের কর্ম্ম এখন এক নূতন পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পর্য্যায়ে আমাদের প্রয়োজন—অতঃপর পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এমনভাবে প্রস্তুত হওয়া, যাহাতে কর্ম্ম ভাগবত শক্তির উপর অন্ধ নির্ভরতায় হাতড়াইয়া না চলিয়া, প্রেরণারই পূর্ণ চেতনার সহিত অগ্রসর হয়। অতঃপর কর্ম্ম হইবে সকল ব্যর্থতা অথবা ভুলভ্রান্তি হইতে মুক্ত নিছক ভাগবত অভিব্যক্তি।"

"...... .....with the full divine power working out its will concealed in its instrument."

অর্থাৎ "যন্ত্রের মধ্যে অধিনিহিত যে ইচ্ছাশক্তি, তাহারই উদ্বোধনে পূর্ণ দিব্যশক্তিই তখন হইবে ক্রিয়াশীল।" কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সিদ্ধ হইবে? এ বিষয়েও তিনি যাহা লিখিলেন তাহার মর্ম্ম, "ইহার জন্য চাই ভারতবর্ষে অন্ততঃ এমন একজন মানুষ, যাঁহার ভিতর দিয়া ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে। আমি দেখিতেছি—আমার মধ্যেই এই শক্তি পূর্ণ সংবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে; অবশ্য এই গতির সংবেগ নির্ভর করিতেছে কতকটা আমার শরীর-মনের অশুদ্ধতা দূরীকরণের উপর এবং কতকটা আমার বন্ধুবর্গ ও উত্তরসাধকদের দোষত্রুটিগুলির বিশুদ্ধতা-সম্পাদনের উপর। আমাকে অধ্যাত্মভাবে এই সকলই বহন করিতে হইতেছে। ফলে আমার দ্রুত উন্নতিও ব্যাহত হইতেছে। বর্ত্তমান পর্য্যায়ে সিদ্ধ হইবার জন্য অন্ততঃ কিছু সময় আমার প্রয়োজন। ইহা সিদ্ধ হইলে, বাকীগুলি অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। অন্যথায় যে বীজ লইয়া আমরা যোগপথে অগ্রসর হইতেছি, তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইবে, অথবা খুব সামান্যতঃই ফলপ্রসূ

হইবে। এইজন্যই আমি যে তোমাকে বিপ্লবের কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছি, তাহার প্রথম কারণ ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।"

"That is the first reason why I call you Halt !"

'ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণবশতঃ আমি বিপ্লবের কর্ম্ম থামাইতে চাহিতেছি। তাহা হইতেছে':

"Others should receive the same power and light. In the measure that mine grows, theirs also will increase in power, provided always they do not separate themselves from me by the *ahankara*."

অর্থাৎ "আমি চাহি যে, আমার মতই শক্তি এবং আলো সকলে লাভ করুক। আমার মধ্যে এই শক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, যদি তাহারা অহঙ্কারবশতঃ আমা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও তদনুরূপ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।"

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন একটী শক্তিশালী সংহতি গড়িতে চাহিতেছিলেন, যে সংহতি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের মুক্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন:

"The power that I am developing, if it reaches consummation, will be able to accomplish its effects automatically by any method chosen."

অর্থাৎ "যে শক্তি বিকশিত হইতেছে, তাহা যদি পূর্ণতা লাভ করে, তবে তাহা যে কোন নির্ব্বাচিত পথেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে কার্য্যক্ষম হইবে।"

পূর্ব্বে যে বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নূতন করিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চার করিবার যন্ত্রের অন্বেষণে এই সময়ে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। প্রাকৃত শক্তির প্রবল বিরোধিতায় তিনি যে এই পরমা শক্তিকে আয়ত্ত করিবার পথে সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না, তাহা অতিশয় চিন্তার সহিত অনুভব করিতেছিলেন। বিশেষভাবে আমাদের কর্ম্মকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি লিখিলেন:

"It is specially in the field to which your *Kriyas* have belonged and kindred fields that they are still too strong for me."

অর্থাৎ "বিশেষভাবে তোমার ক্রিয়াগুলি যে ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, সেই ক্ষেত্রে ও অনুরূপ ক্ষেত্রগুলিতেই আমি এই বাধা বেশী পাইতেছি, যাহার সহিত আমি পারিয়া উঠিতেছি না।"

আমাদের কর্ম্ম তাঁহার নিকট অতিশয় বেদনাদায়ক বোধ হইল। তিনি চাহিয়াছিলেন—সর্ব্বপ্রকার সংশয়মুক্ত হইয়া যাহাতে আমি দাঁড়াইতে পারি। তিনি মনে করিতেন—যে শক্তি তাঁহার মধ্যে অর্জ্জিত হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বকে প্রবুদ্ধ করিবে। এই শক্তি তিনি আমার মধ্যে ও আরও কয়েকজনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া একটি শক্তিশালী অধ্যাত্ম-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবেন এবং এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কার্য্য করিবেন—তখনই কার্য্য দ্রুত ও সার্থক-ভাবে সম্পন্ন হইবে।

"Then a rapid and successful *Kriya* can be attempted."

অর্থাৎ "তখন দ্রুত ও ফলপ্রসূ ক্রিয়ার জন্য প্রয়াস করা যাইে পারিবে।"

কত ব্যথা ও দরদের সহিত তিনি বাঙালীকে যন্ত্র করিয়া তাঁহা অর্জ্জিত যোগশক্তির সাহায্যে কর্ম্ম করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহ সেদিন সফল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে না পারিলেও, ভবিষ্যতে তাঁহা প্রেরণায় জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমা সংশয় নাই।

* *

*

॥ আট ॥

সে অনেক কথা, প্রায় ১২ বৎসরের ইতিহাস। অতিশয় দীর্ঘ ং বিচিত্র ঘটনাবহুল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রকাশ্য ভাবে গিয়া পস্থিত হই। তৎপূর্ব্বেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরে "রয়েল মেন্সি" ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই অধিকাংশ জবন্দী মুক্তি লাভ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই বারীন্দ্রকুমার াষ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি মুক্তি পাইয়া ন্দামান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাংলার রাজনৈতিক রিস্থিতিও ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় ইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা লাভ করেন। ামাকেও আহ্বান দিয়া তিনি এই সময়ে স্পষ্ট করিয়াই িখিয়াছিলেন :

"I have thought to delay your visit for a short time, ıtil I saw my way more clearly on certain important atters ; but I now believe that it is not necessary and it ill be as well for you to come as soon as it may be."

অর্থাৎ 'আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে ামার পথের স্পষ্টতা না দেখা পর্য্যন্ত তোমায় এখানে আসিতে িলম্ব করিতে হইবে ; কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস যে, আর তাহার ্রয়োজন নাই ; তোমার সুবিধামত যত শীঘ্র হয় আসিতে ার।'

তাঁহার পত্র পাইয়া আমি তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। এ
সময়ে তাঁহার কিছু ভাবান্তর নজরে পড়িল। তিনি যথারীতি
দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করেন। কিন্তু আমার বন্ধু
কেহই আর সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্
আমাকেই থাকিতে হয়। তারপর মীরা দেবী আসিয়া উপবেশ
করেন। শ্রীঅরবিন্দ ঊর্দ্ধের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকেন
আমরা উভয়েই নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করি। সন্ধ্যার আলো জলিয়া
উঠিলে মঁসিয়ে রিশার আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। মঁসিয়ে রিশার
এই সময়ে তাঁহার রচিত একখানি ফরাসী গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ
করার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের সহায়তা লইতেন। ইহাই "আর্য্য"
পত্রিকায় "Eternal wisdom" নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত
হইত।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে টাইপরাইটার লইয়া দীর্ঘ সময়
কার্য্যতৎপর দেখিয়াছিলাম। তাঁহার শরীর অধিকতর কৃশ
হইয়াছিল। মীরা দেবীর উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তিনি
আমাদের স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন "যে গরুর দুধ শ্রীঅরবিন্দ পান
করেন, সেই গাভীটির নিশ্চয়ই ক্ষয়রোগ আছে। ঐ গরুর দুগ্ধ
পান তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইবে।"

এই সময় হইতেই শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব মীরা দেবী
গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই ইহাতে প্রীতি অনুভব
করিলাম। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের
মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। ইহার পূর্ব্বে আমি
দেখিয়াছি—আমার বন্ধুরা মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া চলিয়া
যাওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ রুক্ষ-মাথায় স্নান সারিয়া, দেওয়ালে টাঙ্গান

একটা আয়নায় ভাঙ্গা চিরুণীর সাহায্যে কেশ আঁচড়াইয়া লইতেন। তারপর তিনি ভোজনপাত্রের সম্মুখে বসিতেন। আমি বসিয়া-বসিয়া মাছি তাড়াইতাম। শ্রীঅরবিন্দ কয়েক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিয়াই উঠিয়া পড়িতেন। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে উপরে গিয়া উঠিতাম। মীরা দেবীর তত্ত্বাবধান-ভারগ্রহণের পর হইতে তাঁহার প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, বৈকালিক ও নৈশ-ভোজনের সুব্যবস্থা হইল। শ্রীঅরবিন্দ আত্মভোলা শিবের মত, নিজের সুখের দিকে কোন দৃষ্টিই তাঁহার থাকিত না। মীরা দেবীর যত্নে শ্রীঅরবিন্দের শ্রী ফিরিল।

এই সময়ে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে আমরা মঁসিয়ে রিশারের বাড়ী যাইয়া রাত্রি-ভোজন সমাপ্ত করিতাম। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মীরা দেবীর অন্তর তখন এমনই ভরিয়া উঠিতেছিল যে, মঁসিয়ে রিশার তাহা লক্ষ্য করিয়া অভিভূতের ন্যায় আমাদের কাছে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন "আমি ক্রমেই মীরার মন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। মীরার সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিতেছেন শ্রীঅরবিন্দ।"

একদিন অপরাহ্ণে আমরা তিনজনেই ধ্যানমগ্ন। ধ্যান-শেষে মীরা দেবী ও আমি ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়ের কথা প্রসন্ন মুখে শ্রীঅরবিন্দ শুনিতে লাগিলেন। মীরা দেবী বলিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরলোকের অপার্থিব দৃশ্যের কথা। তাঁহার অসাধারণ দর্শনের কথা আমি বিস্মিত হইয়া শুনিলাম। আমার ধ্যান জাগ্রৎ-বিগ্রহ শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া। তাঁহার রজত-শুভ্র শ্মশ্রু ও জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার চিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আমি মীরা দেবীর অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা শুনিয়া যুগপৎ পুলকে

ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের এইরূপ ধ্যানের শেষে প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "মতি! তুমি, আমি"—তারপর হস্ত প্রসারণ করিয়া মীরা দেবীকে দেখাইয়া বলিলেন, "আর এই নারী—আমরা তিনজনে সঙ্ঘ।" তারপর শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশচ্ছলে বলিলেন, "এই তিনজনেই আমরা জগতের পরিবর্ত্তন আনিব।" সেদিন আমি মীরা দেবীকে নূতন চক্ষে দেখিলাম। তিনিও যেন আমায় বড় আপন করিয়া লইলেন। কিন্তু একদিনের কথায় সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। সেদিন আমার এক বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মীরা দেবী শ্রীঅরবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া পরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার সহিত আপনি কি সম্বন্ধ অনুভব করেন?" 'আমি হাসিয়াই বলিলাম—"আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ ভ্রাতা-ও-ভগ্নীত্বের। আমরা উভয়েই শ্রীঅরবিন্দের নিকট দীক্ষিত।" তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন "No, no I like to be Mother."

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আমি কি ভাবে মীরা দেবীকে মাতৃত্বে বরণ করিয়া লইব, বুঝিতে পারিলাম না। আমি তন্ত্র-সহজিয়ার সাধনার আদ্যাশক্তি মহামায়ার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম্মপত্নী মৃণালিনী দেবীকে আমি স্বাভাবিক গুরুশক্তিস্বরূপেই অধ্যাত্ম-মাতৃত্বে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মাতা মৃণালিনী পরলোকগমন করিলে, আমাদের তাঁতশালার নাম রাখিয়াছিলাম তাঁহার স্মরণে "মৃণালিনী বস্ত্রবয়ন কার্য্যালয়।" মীরা দেবীর মাতৃত্বের দাবী আমার অস্বস্তিকর মনে হইল। এইদিন হইতেই মীরা দেবীর সহিত যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কসৃষ্টি হইতেছিল, বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহা

উপর আঘাত পড়িতে সুরু করিল। বিশেষতঃ এক রাত্রির ঘটনা এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাতে আর যেন নিরাময় হওয়ার কোনই আশা রহিল না।

এতদিন আমাদের অধিবেশন-চক্র দ্বিতলের বারান্দায় হইত। অকস্মাৎ তাহা নিম্নতলে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমার চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। কিন্তু আপন অন্তরের অনুভূতি দিয়া পরে স্থির করিয়া লইলাম—শ্রীঅরবিন্দের আরোহণ-যুগ শেষ হওয়ায় অতঃপর তাঁহার অবতরণের পালাই সুরু হইয়াছে এবং তাহারই লক্ষণস্বরূপ তিনি নিম্নতলে চক্রানুষ্ঠানেব আয়োজন করিয়াছেন। তথায় গিয়া উপবেশন করিতেই, শ্রীঅরবিন্দের মুখে নানা অশরীরী আত্মার বাণী প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকজন অপরিচিত আত্মার কথা আমরা নীরবে শুনিবার পর, শুনিলাম রাজা রামমোহন রায়ের আত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার মুখে অনেক অধ্যাত্মযোগের কথা আমরা শ্রবণ করিলাম। সে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। ইহার পর আসিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীঅরবিন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন আত্মচেতনায়। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া পরে তিনি বলিলেন, "আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর নূতন সমাজ, নূতন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কর্ম্ম হইবে উপর হইতে।" তারপর তিনি মাথার উপর প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ হাত উঠাইয়া বলিলেন "এই বিজ্ঞানভূমি হইতেই সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবে।" পরিশেষে আমার দিকে চাহিযা করুণার্দ্র চক্ষে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "মতিলালের সাধন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, সে আমার কথা বুঝিবে; কিন্তু "he puts a wall between him and me." অর্থাৎ "সে আমার ও তার মধ্যে একটি প্রাচীর

রাখিয়া দিতেছে।" আমার মনে হইল, এই কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইলেও, ইহা যেন মীরা দেবীরই অনুভূতির প্রতিধ্বনি। কারণ শ্রীঅরবিন্দ যে সঙ্ঘের প্রেরণা পাইয়াছিলেন, সেখানে মীরা দেবী ও আমার মধ্যে একটি সম্বন্ধস্থাপনের কথা ছিল। আমি তাঁহাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই বলিয়াই কি শ্রীঅরবিন্দের মুখে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারিত হইল! আমি সেই ক্ষেত্রে কিরূপ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা "জীবনসঙ্গিনী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, উহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

"নেশা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। চক্ষে স্বর্ণের দীপ্তি। কর্ণে অমৃতের অনুভূতি। শক্ত নীরেট পৃথিবীমণ্ডলটাই যেন দ্রবণীয় মনে হইতেছিল। অকস্মাৎ নিষ্ঠুর বজ্রনাদের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের এই কথাটি আমায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। প্রথম মনে হইল—কথাটি জানালার বাহিরে ঐ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, ঐখান হইতে বুঝি কোন অজ্ঞাত পথিকের পরুষ পরিহাস হইবে। আমি শ্রীঅরবিন্দের দিকে চাহিলাম। কিন্তু না, এই নিষ্ঠুর আঘাত শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠনির্গতই বটে! আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দ আর আমি, ইহার মধ্যে অন্ধকার-সৃষ্টি স্বপ্নেও কোনদিন দেখি নাই। আত্মসমর্পণের মন্ত্রধ্বনি শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতেরই আকাশে বাতাসে যে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে, তাহাতে অভিষিক্ত হওয়ার সাধেই তন্ত্র-মন্ত্র-উপাসনার রসে অভিভূত হইয়া কত পথ ঘুরিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে গড়াগড়ি দিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলন-বার্ত্তার নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার কত প্রচেষ্টাই না করিয়াছি! শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার পাওয়ার পূর্ব্বেই

ৎসর্গমন্ত্রের মহিমস্তুতি গাহিতে গিয়াই আমার সর্ব্বপ্রথম নাট্য-
াহিত্য-সৃষ্টি 'উদ্বোধন' নাটক। আত্মসমর্পণের আকুলতায় যাজ্ঞার
রুণকণ্ঠ বোধ হয় পার্থ-সারথির কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, এই-
ন্যই না শ্রীঅরবিন্দ তপস্বীর মূর্ত্তি ধরিয়া এ দীনের দুয়ারে
াসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। একাদশ বর্ষ পরে, যখন
ীঅরবিন্দের প্রেমামৃতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প
ইয়া এখানে আসিয়াছি, সে অন্তরের নিগূঢ় সত্যকে এমন
রিয়া নিষ্ঠুর আঘাত দিবার প্রেরণা কেমন করিয়া আসিল?
কান্ দিক্ দিয়া এই অধ্যাত্মমিলনকে ব্যাহত করার রাক্ষসী
ক্তি আসন্ন মহাযুগের পরিপন্থী হইল? শ্রীঅরবিন্দ স্থির-ধীর কণ্ঠেই
ার মর্ম্মানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণীতে সতর্কতা,
থাগুলিও ছিল স্নেহবিজড়িত। কিন্তু আমার চিত্ত তাহাতে তীক্ষ্ণ
শলবিদ্ধ হইল। মনে হইল—এই ১১ বৎসর ধরিয়া নিয়ত শ্রম ও
াধনায় যে সৃষ্টি গড়িয়াছি, তাহার মূল্য একটি কপর্দ্দকও নহে।
ীঅরবিন্দের নিকট আমার আত্মনিবেদনের মূলে কোন কামনাই
ছল না। আকস্মিক ঘটনাস্রোতে তাঁর আগমন। শ্রীঅরবিন্দের
প্রয়োজনে আমার এই ১১ বৎসরের জীবন নিঃশেষ করিতেও
াধে নাই। এই ১১ বৎসরের জীবন-গতিও স্বপ্ন বা কল্পনা নহে।
তার একটা বস্তুতন্ত্র ইতিহাস দীর্ঘায়িত হইয়া আমার সহিত
অনুস্যূত। তাঁরই আদেশে রাষ্ট্রে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে গিয়া,
আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আসক্তির রসায়নে সংসার-সাধনায় ব্যর্থ হইয়া,
তাঁরই আকর্ষণে যোগের মন্ত্রে নূতন ক্ষেত্র-রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছি!

আমার বলিতে এই মুহূর্ত্তে কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই।
শ্রীঅরবিন্দের মুখ দিয়া এমন দারুণ আঘাত কে আমায় করিল?

এমন কথা কেন তিনি আমায় বলিলেন? আপনাকে দেখা কিছুই ছিল না। বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণী যেমন এক মুহূর্তে আয়ুঃহীন হয়, আমার সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে আমিত্বও যেন পুড়ি ছাই হওয়ার উপক্রম হইল। মরণের আর্তনাদে ঘর হইতে প্রাঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে সমস্ত বায়ুমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। আমি উচ্ছ্বসি কণ্ঠে, বিকৃত স্বরে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিলাম—কেন, কে তিনি এমন কথা উচ্চারণ করিলেন? এমন প্রাণঘাতিনী ধারণ কেমন করিয়া তাঁর হইল? বিদ্যুদ্বেগে আমায় কে যেন গ্র করিয়া ফেলিল, সান্ত্বনাবাণীর প্রতীক্ষা করিতে দিল না। টেবিলে উপর রুটি-কাটা একখানি ছুরিকা পড়িয়া ছিল, তাহা মুষ্টিব করিয়া ধরিলাম, তারপর রুদ্রকণ্ঠে কত কি যে বলিয়াছি, তা আমার স্মরণে নাই। সে ঘটনা যদি ভবিষ্যতের সূচনাপর্ব্ব হইত, আমার এই উন্মত্ততা ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি বলিযা বাজে-খাতে খরচ লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু সেদিনের সেই দৈ সঙ্কেতে কঠোর বজ্রের ন্যায়ই আমার জীবনের অতি নিষ্ঠুর সত্য ধরা দিয়াছে। আমি হইয়াছিলাম সেদিন প্রলাপমুখর-ক উন্মত্তের ন্যায় অধীর, বিক্ষিপ্তচিত্ত, নিদারুণ ব্যথিত। সহতীর্থগ ছিলেন নিরপেক্ষ দর্শক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নয়ন স্নেহার্দ্র হই উঠিয়াছিল। তাঁর সেই সুধাভিষেকে বজ্রাহত ব্যথিত হৃদয় ধীরে ধীরে শান্ত-সমাহিত হইল। মাংসপেশী শিথিল, ধমনীর রক্তস্রোত মন্থর, শিরা-উপশিরা আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নিথর স্তব্ধত্বে আমাদের অতিবাহিত হইল, তাব নীরবেই আমরা সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম। সে দুর্য্যোগময়ী রাত্রি দুর্ঘটনার কাহিনী আমার হৃদয়ে চির ক্ষত সৃষ্টি করিয়া রাখিল

ইহার পর তিনদিন আর শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাক্যালাপ রহিল না। একটি অতি ক্ষুদ্র কথা হৃদয়-ভেদ সৃষ্টি করিল। আমি অনুভব করিতে লাগিলাম—শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার ব্যবধান দুর্ল্লঙ্ঘ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন "তোমার যোগ তোমার জন্য নয়, নিখিল মানবজাতির জন্য। তোমার যোগে লয় নাই, মোক্ষ নাই, আছে অনন্ত ভাগবতজীবন।" তাঁর এমন অনেক কথাই হৃদয়ে চিরাঙ্কিত ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। তেমনি তাঁহারই মুখে সেদিন এই প্রাচীর তোলার কথাটিও আমার বুকে বিঁধিয়া, মর্ম্ম ভাঙ্গিয়া দিল। এই তিনদিনের আকুলতাময়ী প্রতীক্ষাও কার্য্যকরী হইল না। তিনি যথানিয়মে দৈনন্দিন কর্ম্ম করিয়া চলেন—সংবাদপত্র পাঠ করেন, স্নান, আহার, হাস্যপরিহাস করেন ; আমি দূরে-দূরে ঘুরিয়া বেড়াই। একবার ডাকিলেই হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় হয়, কিন্তু সে পাত্র শ্রীঅরবিন্দ নহেন। তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। আমার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। হৃদয়ের আগুন মাথায় উঠিল। সে কি ভীষণ যন্ত্রণা ! আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। শ্রীঅরবিন্দ আকাশপানে স্থিরদৃষ্টিতে একা তখন বসিয়াছিলেন। অভিমানবিজড়িত কণ্ঠে গিয়া জানাইলাম—অসহ্য যন্ত্রণার কথা। রুদ্ধ স্নেহের উৎস আমায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "এত শীঘ্র মাথার যন্ত্রণা হইবে, তাহা মনে করি নাই ; ভয় নাই, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর এই প্রসঙ্গ লইয়া অবশ্য কোনই আলোচনা করেন নাই। ইহার পরেও মীরা দেবীর সহিতও আমার হৃদয়-সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই। সে-বার বিদায়কালে শ্রীঅরবিন্দ যেমন

আমায় বুকে ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আমি মীরা দেবীর হস্ত ধরিয়া ভগ্নীত্বের স্নেহ-রসায়নেই বুঝি নিজেকে অভিষিক্ত করিয়াই সেখান হইতে ফিরিয়াছি। মঁসিয়ে রিশার আমাদের এই বিদায়কালীন দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন তাঁহার মুখে-চোখে এই আভাসই যেন দেখা দিয়াছিল।

মঁসিয়ে রিশার ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই অকস্মাৎ চন্দননগরে আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁর মুখেই মীরা দেবীর সহিত তাঁর চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে, শুনিলাম তাঁহার কথায় বুঝিলাম—মীরা দেবী এক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের নিকটই বাস করেন।

মঁসিয়ে রিশারের মর্ম্মপীড়া দূর করার যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম আমার গৃহদেবীও অতি সতর্কতার সহিত মঁসিয়ে রিশারের চিত্তক্লেশনিবারণের প্রয়াস করিলেন। মীরা দেবী ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতেই কিভাবে অন্তরলোকে এক দিব্য পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি সেই কিশোর বয়সেই স্বতঃই "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত করিতে ভালবাসিতেন এবং ঘটনাচক্রে তাঁর স্বামীর সহিত কিভাবে পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার হয় ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট "কৃষ্ণ" বলিয়াই চিনিতে পারেন, এই সকল কথা বিশদভাবে লিখিয়া পণ্ডিচারী হইতে আসিবার সময়ে আমার হাতে একটি নিবন্ধ দিয়াছিলেন; আমি তৎকালে মীরা দেবীর ছবির সহিত আমাদের "প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করি। ঐ ছবি ও লেখা আমার গৃহে মঁসিয়ে রিশার হঠাৎ দেখিতে পাইয়া একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ক্ষোভে-রোষে আমায় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া

সেই যে বাহির হইলেন, তিনি আর ফিরিলেন না। শুনিয়াছি—তিনি চন্দননগর হইতে শান্তিনিকেতন হইয়া সবরমতীতে কিছুদিন ছিলেন, তারপর প্যারিস-যাত্রা করেন।

পণ্ডিচারী হইতে শ্রীঅরবিন্দ পত্রে তাঁহার আদর্শের মর্ম্মবাণী লিখিয়া আমায় উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। চন্দননগর হইতে আমাদের প্রকাশিত "Standard Bearer" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি যে আদর্শের কথা চমৎকার যুক্তি ও অনুপ্রেরণাপূর্ণ ভাষায় ঘোষণা করিলেন, তাহাতে তিনি লিখিলেন :

"Our first object shall be to declare this ideal; insist on the spiritual change as the first necessity and group together all who accept it and are ready to strive sincerely to fulfil it. Our second shall be to build up not only an individual but a communal life on this principle."

অর্থাৎ 'আমাদের প্রথম লক্ষ্য হইবে—এই আদর্শের ঘোষণা করা, অধ্যাত্মপরিবর্ত্তনের উপরে জোর দেওয়া—উহাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বলিয়া—আর যাহারা ইহা স্বীকার করিবে ও ইহা সিদ্ধ করার জন্য আন্তরিকতার সহিত প্রস্তুত হইবে, তাহাদের একত্র করা। আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য—এই নীতির উপর শুধু ব্যক্তিজীবন গড়িয়া তোলা নয়, পরন্তু একটা সঙ্ঘজীবনও সংগঠিত করিয়া তোলা।'

ইহারই শেষাংশে ছিল :

"It is with a confident trust in the spirit that inspires us that we take our place among the standard-bearers of the new humanity that is struggling to be born

amidst the chaos of a world in dissolution and of th
future India, the greater India of the re-birth that is t
rejuvenate the mighty outworn body of the ancie
Mother."

অর্থাৎ 'যে ভাবশক্তি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাহারই উ
সুদৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিয়া, আমরা সেই নব মানবজাতির পতাক
বাহীদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছি, যে জাতি একটা বিলীয়মা
জগতের ছন্দোহীন প্রলয়-বেদনায় নবজন্মেরই তপস্যা করিতেছে
আর সেই ভবিষ্য ভারত, যে বৃহত্তর ভারতের নবজন্মে আমাদে
এই প্রাচীন দেশমাতৃকার জীর্ণদেহ নবমূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহার
প্রবর্ত্তকদের মধ্যে আমাদের স্থান হইবে।'

এই সঙ্ঘ-সৃষ্টির প্রেরণাটিকেই চন্দননগরে রূপায়িত করিতে
গেলে, উহাতে উৎসাহ দিয়াই তিনি আমায় আবার লিখিলেন :

"The Samgha at Chandernagore is a thing that ha
grown up with my power behind and yours at the centr
and it has assumed a body and temperament, which i
the result of this organisation."

অর্থাৎ 'চন্দননগরে আমার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ও তোমাকে
কেন্দ্র করিয়া একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে ; আর এইরূপ সংগঠনে
ফলে উহার একটি আকৃতি ও প্রকৃতিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

বারীন্দ্রকুমারের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও দেশের অন্যান্য কর্ম্মধারা
সহিত তাহার পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া
লিখিলেন :

"Our whole principle is different and you have t
insist on our principle in all that you say or dc

oreover, you have got a clear form for your work in
sociation anđ that form as well as the spirit you must
aintain, any loosening of it or compromise would mean
nfusion and impairing of the force that is working
your Samgha."

অর্থাৎ 'আমাদের মূলতত্ত্ব অন্য হইতে পৃথক্। তুমি যাহা
লবে ও করিবে, তাহাতে এই মূল তত্ত্বের উপর জোর দিয়াই
তামাকে চলিতে হইবে। অধিকন্তু তুমি ইহার জন্য সঙ্ঘরূপ
। স্বচ্ছ বিগ্রহ পাইয়াছ, সেই সংস্থা ও এই তত্ত্ব বজায় রাখিয়াই
তামায় অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা কোনরূপে যদি শিথিল হয়
থবা কিছুর সহিত যদি আপোষ করিতে হয়, গোলযোগ বাধিবে
যে শক্তি তোমার সঙ্ঘে লীলায়িত হইতেছে, তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া
ড়িবে।'

পত্রশেষে এই দুই ছত্র আমায় পুনরায় উন্মাদের ন্যায় পণ্ডিচারীর
াথে ছুটাইল :

"Meanwhile your visit may help to get things in to
reparatory line both in the motor-power and the
utward determination."

অর্থাৎ 'ইতিমধ্যে তোমার উপস্থিতি অন্তরের বিদ্যুৎ-যন্ত্র ও
বহির্মুখী সঙ্কল্পনিরূপণের সকল ব্যাপারকে পরিণতির দিকে আনিতেই
সহায়তা করিতে পারে।'

এবার তাঁর পত্রে আমায় সস্ত্রীক পণ্ডিচারীগমনের অনুমোদন
ও দীর্ঘদিন তথায় থাকার নির্দ্দেশ তিনি দিয়াছিলেন। আমি
কালবিলম্ব না করিয়া তাঁর কথার অনুসরণ করিলাম ও ১৯২১
খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উভয়ে পণ্ডিচারীতে গিয়া পৌঁছিলাম।

প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিতে গেলে, আমার সঙ্গে আমার পত্নীও তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতা হইলেন। প্রণাম করিতে গিয়া তিনি একপ্রকার ধ্যানস্থা হইয়াই পড়িলেন। তদবস্থায় শ্রীঅরবিন্দও দীর্ঘক্ষণ মুদিত নয়নে তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। ধ্যানভঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের চরণধূলি মাথায় লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে, আমার হাতে এক তাড়া নোট দিয়া শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জন্য যে নূতন বাড়ী লওয়া হইয়াছে, সেই বাড়ীতে গিয়া আমাদের উঠিতে বলিলেন।

মীরা দেবীর সন্ধান লইতে গিয়া অবগত হইলাম যে, তিনি উপরেই আছেন। যে ঘরখানিতে গত দুইবার পণ্ডিচারীতে আসিয়া আমি অবস্থান করিয়াছিলাম, সেখানেই তিনি এখন থাকেন। দ্বার ঠেলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম— তিনি পূর্ব্ববেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পরিধানে লালপেড়ে শাড়ী, চরণ-যুগল অলক্তরঞ্জিত—ভারতীয়া মাতৃমূর্ত্তির ন্যায়। আমি তাঁহাকে প্রণাম জানাইলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার পত্নী মীরা দেবীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে প্রণাম করিতে বলিলাম। তিনি তবুও স্থির দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রণাম করিলেন না।

আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। মীরা দেবী দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। আমি নূতন বাসা-বাটীতে উপস্থিত হইয়াই আমার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি মীরা দেবীকে প্রণাম করিলেনা কেন ?" বার-বার প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে কোনই উত্তর পাইলাম না। আমি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে নবম-বর্ষীয়া বালিকা বধূকে ঘরে আনিয়াছিলাম, কথায়-কথায়

াামার শাসন অধিক মাত্রায় হইত। আমি ক্রোধভরে আবার বলিলাম মীরা দেবীকে প্রণাম না করিয়া অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ।"

তিনি উন্নত শিরে বলিলেন "তোমার মাথা শ্রীঅরবিন্দের রণে নত হইলে, আমিও চেতনাহারার ন্যায় তাঁহার চরণতলে াছাড় খাইয়া পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু এখানে তোমার প্রণতি আমার াল লাগে নাই।" আমি পরুষকণ্ঠে 'কেন ? কেন ?' বলিয়া তাঁহাকে ৎর্সনা করিলাম। তিনি মাথার সিন্দুর দেখাইয়া বলিলেন "আমি সিয়ে রিশারের দুঃখ দেখিয়াছি। যে নারী পতিত্যাগিনী, াহার স্বামী সৌভাগ্যহীন হয়—তাঁহার চরণে মাথা নত করিয়া এই পবিত্র সিন্দুর আমি ম্লান করিতে পারিব না।"

তখনই বুঝিলাম—আমার পণ্ডিচারী আসা ব্যর্থ হইবে। মীরা-দেবীকে মা বলিতে হইলে, গৃহদেবীকে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু আমার ানে হইল—তিনি আমার অপরিত্যজ্যা।

প্রতিদিন প্রভাতে সস্ত্রীক শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া বসি। াঁর মুখে অনর্গল উপদেশবাণী শ্রবণ করি। আমার পত্নী ধরিয়া সিলেন -আমাদের গৃহে শ্রীঅরবিন্দকে একদিন নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। তিনি নিজেই বলিলেন "চন্দননগরে অবস্থানকালে অতি সন্তর্পণে আপনার আহারের ব্যবস্থা করেছি। আজ আপনাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাবার ইচ্ছা হয়েছে।"

শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "হবে, হবে, তোমার ইচ্ছা সফল হবে।"

আমার স্ত্রী বলিলেন—"কবে হবে ?"

শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—"কালই।"

পরদিন আসিল। পর-পর কয়েকদিন চলিয়া গেলেও, শ্রীঅরবিন্দের

যাওয়া ঘটিল না। আমার পত্নী নিরতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন। ষোড়শোপ-চারে শ্রীঅরবিন্দকে পূজা দেবার প্রেরণা তাঁহার ব্যর্থ হইল। তিনি তবুও আশা ছাড়িলেন না। কথায়-কথায় একদিন তিনি আবার শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন "আপনি অন্যত্র গিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষায় অসমর্থ; কিন্তু আমি যদি কিছু খাবার পাঠাই, আপনি খাইবেন ত?"

শ্রীঅরবিন্দ সহাস্যে বলিলেন "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নিমন্ত্রণ-রক্ষার আমার অনেক বাধা আছে—খাবার পাঠাইও, খাইব।"

অত্যন্ত প্রীতি-সহকারে আমার স্ত্রী নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি দূরে নিক্ষিপ্ত হইযাছে এবং কি-জন্য তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি খাইতে দেওয়া হয় নাই, ইহাও যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিল। তাঁহার ব্যথার ভার বহিয়া পণ্ডিচারীতে বাস করিতে আমিও যেন অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রেমে ও স্নেহে অভিভূত হইয়া আমি তবুও দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

ঠিক এই সময়ে চন্দননগর হইতে 'তার' পাইলাম "Won't Kakima come, strong Samgha need." মধ্যের কথাটি অস্পষ্ট। ভাবে বুঝিলাম—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাঁহাব প্রত্যাবর্ত্তন চায়। আমার পত্নীও বলিলেন "আমি তোমার বাধা হইয়া এখানে থাকিতে চাহি না। আমায় পাঠাইয়া দাও, যোগ সিদ্ধ হইলে তুমি চন্দননগরে ফিরিও।"

শ্রীঅববিন্দকে এই কথা জানাইলাম, তিনি আমার পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই ব্যক্তিটির যোগের সিদ্ধি তুমি ভিন্ন অন্যে আনিবে না, তোমার যাওয়া বন্ধ থাকিবে।"

ইহার উপর আর কথা নাই। নানা নির্য্যাতন সহিয়া আমাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাবপর ৯ই আগষ্টে শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র আবার তারে জানাইল "সম্মুখে ১৫ই আগষ্ট, শীঘ্র আপনি আসুন।" টেলিগ্রামের শেষ কথা "Our victory is here"— 'আমাদের সাফল্য এইখানেই।'

শ্রীঅরবিন্দকে এই 'তার' দেখাইলাম। তিনি কোনদিন কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেন না; কিন্তু এই টেলিগ্রামের উত্তর দিতে তিনি নিজেই আদেশ করিলেন—

"Write a big 'no' there"—ওখানে লিখে দাও একটা প্রকাণ্ড 'না'।

তার পরদিন আবার অরুণ 'তার' করিল—"ফিরিয়া আসুন, অন্যথা eternal separation অর্থাৎ চিরবিচ্ছেদ।" এই 'separation" শব্দের অর্থ যদি সঙ্ঘ হইতে বিদায় মনে হইত, আমি ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। এমন ঘটনা আমার জীবনে বহু ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি এই শব্দের অর্থ মৃত্যুই বুঝিলাম। আমি তিনদিন একাগ্রচিত্তে ভাবিলাম। তারপর কে যেন আমায় জোর করিয়াই লিখাইয়া লইল "অরো! আমি চলিলাম, আজ হইতে আপনার সঙ্গে হইল আমার eternal separation."

নিষ্ঠুর বিধাতা এমন করিয়াই পণ্ডিচারীর সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। আমার স্ত্রী শুনিয়া বলিলেন "তুমি ফিরে চল, অরুণের টেলিগ্রাম উপলক্ষ্য। আমি এসে অবধি দেখছি—শ্রীঅরবিন্দ তোমার আপন জন, কিন্তু তোমার সাধনার স্থান এ নয়।"

আমি একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় ১০ই আগষ্ট তারিখের প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ ব্যথিত

স্বরে "আর প্রয়োজন নাই", এই কথা বলিয়াই নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আমার পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবী অপসৃত হইতে চাহিল। আমি টলিতে-টলিতে বাসায় ফিরিলাম। তাঁহার বাণী আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছিল—"আর প্রয়োজন নাই।" কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা কি সত্যই ছিন্ন হইল? সারা দিন চিন্তা করিলাম। আমার মনে হইল—শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সম্বন্ধ মর্ত্ত্যবাসীর চক্ষে হয় তো চির-বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অমৃতময় অন্তর-যোগ কোনদিন ছিন্ন হইবে না। সে সাধ্য আমারও নাই। শ্রীঅরবিন্দেরও নাই। আমি এই দিনেই সন্ধ্যার সময়ে আবার শ্রীঅরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি গভীর কণ্ঠে বলিলাম "চলুন, আপনার ঘরে চলুন।"

তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন "না, না,।"

আমি তবুও জিদ ধরিয়া বলিলাম, "আসুন, আপনার ঘরে।" এতক্ষণ তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রু যেন অন্তরের ক্ষোভে ও অভিমানে কম্পিত হইতেছিল। অকস্মাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন তিনি প্রসন্ন হইলেন—শিবের ন্যায় শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

তিনি শয্যাগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাঁর চরণে প্রণত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভবিতব্য রুদ্রবীণায় বুঝি সুর বাঁধিয়াছিল।

আমি কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"বিদায়, আজ আমি চিরবিদায় লইতেছি।"

চারি চক্ষে অমৃতনির্ঝর ঝরিল। আমিও কাঁদিলাম। শ্রীঅরবিন্দের ক্ষুঃও সজল হইয়া উঠিল। তিনি আমায় আবার বুকে তুলিয়া লিলেন —

"একনিষ্ঠ হও। তোমার মধ্যে সত্য ও আলো আবির্ভূত হোক।"

শ্রীঅরবিন্দের মুখের এই শেষ আশীর্ব্বাদ মাথায় বহিয়াই সেদিন াণ্ডিচারী হইতে ফিরিয়াছি। আজও সেই স্মৃতি বুকে রাখিয়াই ঠোর কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়া চলিয়াছি। তারপর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ই ডিসেম্বর তাঁহার ইহধাম-পরিত্যাগের কথা বুকে বজ্রের মতই বিদ্ধ ইয়াছে। আমার কাহিনীরও শেষ এইখানেই করিতে হইল।

* *

*